দাম : ষোলো টাকা

দীনদয়াল উপাধ্যায় :
জীবন, কর্ম ও একাত্ম
মানবদর্শন — পৃঃ ১৫

স্বস্তিকা

ফ্রান্সের বর্তমান সংকট এবং
ভারতের ভাবনা
— পৃঃ ১১

৭৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা।। ৯ নভেম্বর, ২০২৬।। ২২ কার্তিক, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

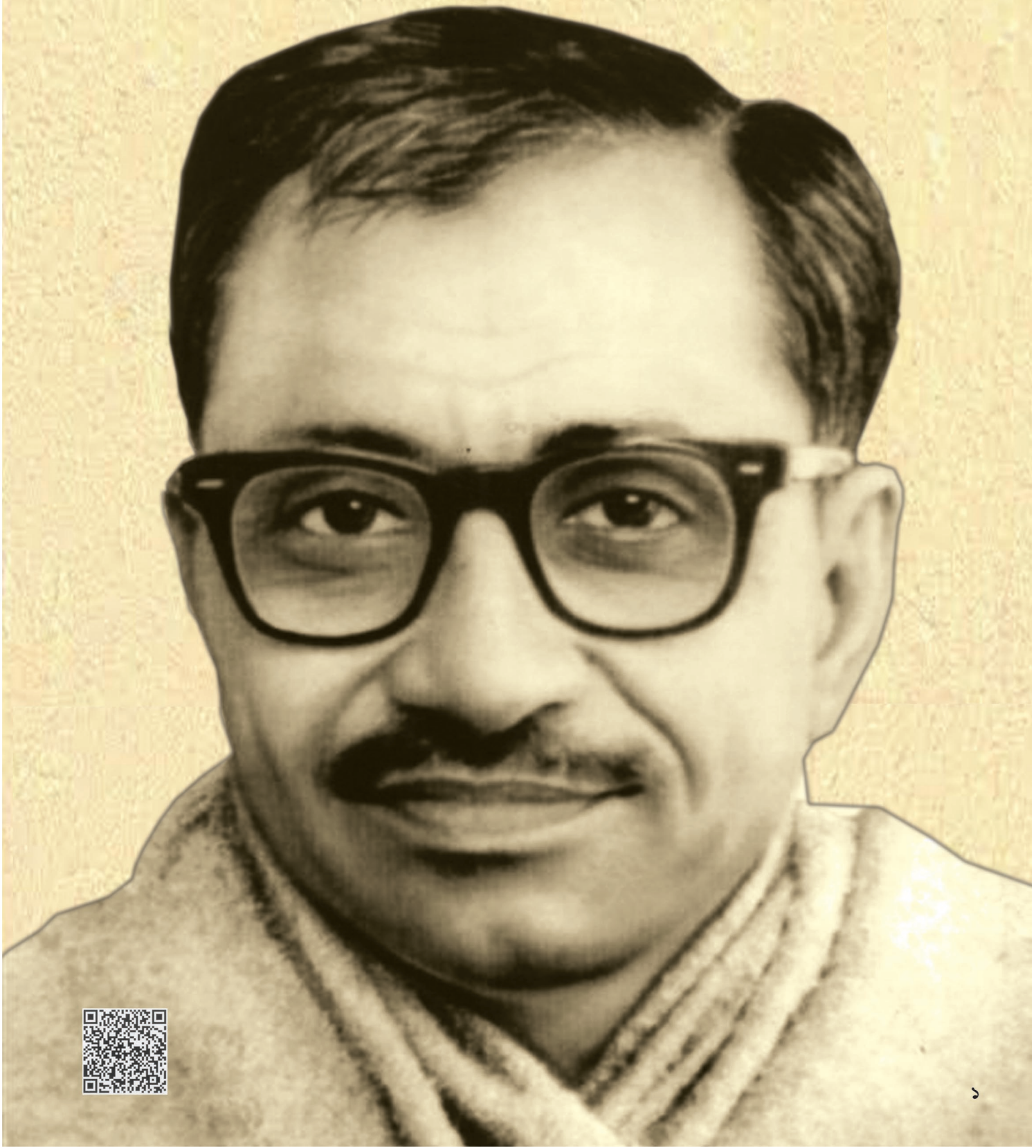

कुटुंब प्रबोधन

जीवन यात्रा की नौका है परिवार,
जिसमे हम सात जन साथ हैं,
भवसागर पार करने हेतु

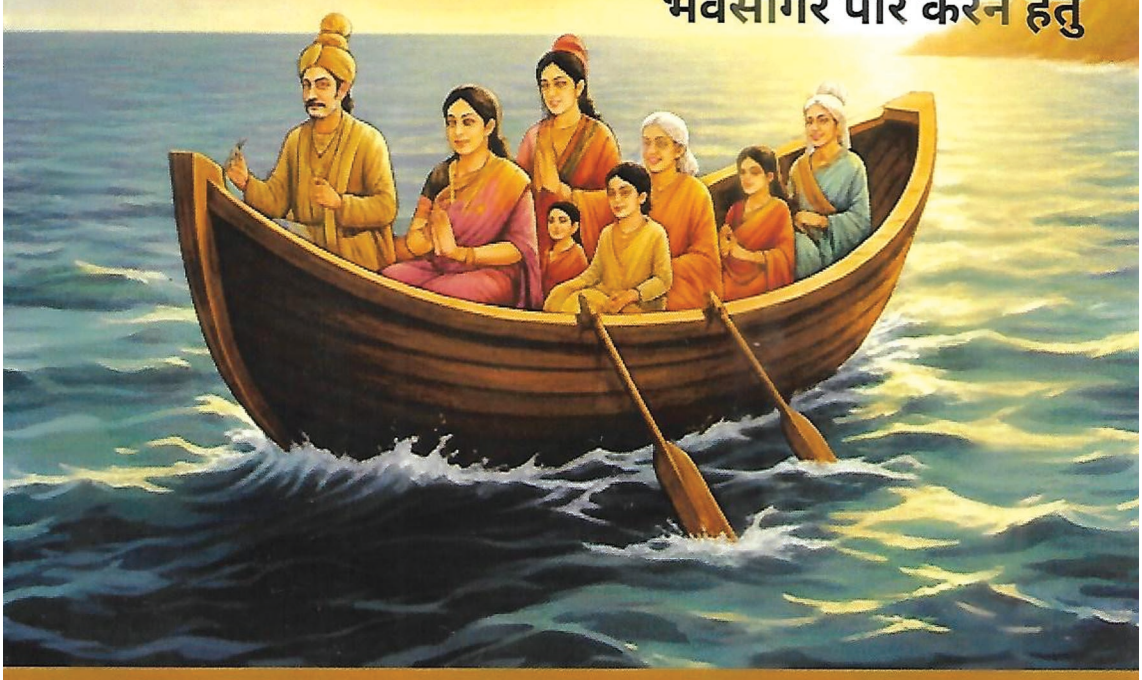

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৯ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ২২ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

৯ নভেম্বর - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

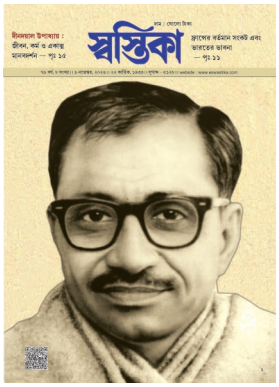

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

তোরা কবি গাইবি আর পয়সা নিবি তোষামোদির কী কারণ 'লাল পতাকা আজও লজ্জার পতাকা'
☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

এত প্রেম কেন গো দিদি! ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

বিভাজিত বিশ্বকে একত্রীকরণের উপায় : একাত্ম মানুবদর্শন
☐ মহাদেবায় করদল্লী ☐ ৮

ফ্রান্সের বর্তমান সংকট এবং ভারতের ভাবনা
☐ ডঃ গৌতম কুমার মণ্ডল ☐ ১১

জনমত হারিয়ে রেজিম চেঞ্জের ভরসায় এখন রাজনৈতিক বিরোধীরা ☐ রঞ্জন কুমার দে ☐ ১৩

দীনদয়াল উপাধ্যায় : জীবন, কর্ম ও একাত্ম মানবদর্শন
☐ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ☐ ১৫

হিন্দুত্ব : সনাতনী ভারতবর্ষের জীবনচর্যা
☐ শাণিত শুভ্র ভট্টাচার্য ☐ ১৭

ককরোচ পার্টি, আন্দোলন ও কিছু প্রশ্ন
☐ দেবদত্তা চক্রবর্তী ☐ ১৮

রাজ্যের বিজেপি পরিচালিত সরকার ষান্মাসিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ ☐ সুবল সরদার ☐ ২০

কাশী আজকের বারাণসী—এক জীবন্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ নগর ☐ ডঃ জয়দেব বিশ্বাস ☐ ৩১

রামায়ণ, প্রশাসন ও সুশাসন ☐ প্রাণকৃষ্ণ সরকার ☐ ৩৩

পণ্ডিত দীনদয়ালজীর রাজনৈতিক দর্শন
☐ বাপ্পাদিত্য মাইতি ☐ ৩৫

হিন্দু ধর্ম চিন্তন এবং একাত্ম মানবদর্শন
☐ বিদ্রোহী কুমার সরকার ☐ ৩৭

কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের কণ্টকাকীর্ণ মার্গ পেরিয়ে অন্ত্যোদয়ের লক্ষ্যে ধাবমান একাত্ম মানবদর্শন
☐ ডঃ অনিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৪৩

মহামনীষার অভিযান : বার্নার্ড শ' ও তাঁর ভারত অনুসন্ধান
☐ গৌতম সেনগুপ্ত ☐ ৪৫

রবীন্দ্র অনুসারী সত্যজিৎ রায় ☐ মনামি ঘোষ ☐ ৪৭

বিজ্ঞান চেতনা ও কল্পনাবিলাসী রবীন্দ্রনাথ
☐ ডঃ সমীর চন্দ্র দাস ☐ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

☐চিঠিপত্র : ১৯ ☐অঙ্গনা : ২১ ☐সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে ১৬ নভেম্বর ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৬ নভেম্বর ২০২৬

পদার্থবিজ্ঞানী অশোক সেনের বিশ্বজয়

বিশ্বের দরবারে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন বাঙ্গালি পদার্থবিজ্ঞানী ড. অশোক সেন। সম্প্রতি অস্কার ক্লেইন পদকে ভূষিত হয়েছেন এই বঙ্গবিজ্ঞানী। পদার্থবিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি-স্বরূপ তাঁকে এই পদক প্রদান করা হয়।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিজ্ঞানীর বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঊনআশিতম বর্ষ পূর্ণ করল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মূল্যবোধের রাজনীতির পুরোধাপুরুষ

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদিগের মধ্যে প্রায়শই একটি বিতর্ক উঠিয়া থাকে যে, রাজনীতি নীতির রাজা না রাজার নীতি? আধুনিক রাজনীতিবিদগণ অবশ্য রাজার নীতি বলিয়াই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা আচার্য চাণক্যের রাজনৈতিক দর্শন এবং তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' ও 'চাণক্যনীতি' বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, রাজনীতি কোনোকালেই রাজার নীতি ছিল না। বরং তাহা নীতির রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম নীতি ছিল। তিনি তাঁহার নীতিকথায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন, 'প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞা প্রজানাং চ হিতে হিতং।' অর্থাৎ প্রজাদের কল্যাণেই রাজার সুখ এবং প্রজাদের কল্যাণেই রাজা বা রাজ্যের কল্যাণ। তিনি আরও বলিয়াছেন, রাজনীতিকে তখনই শ্রেষ্ঠনীতি বলা যাইবে যখন তাহার চালিকাশক্তি হইবে নৈতিকতা, সততা এবং জনগণের সেবা। ভারতীয় রাজনীতির এই চিরন্তন ধারণা দীর্ঘ পরাধীনতার কারণে ভারতীয় শাসকবর্গ বিস্মিত হইয়াছিলেন। দেশবাসী স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেও তৎকালীন জাতীয় শাসকবর্গ রাজনীতিতে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। তাহাদিগের মন ও মানসিকতা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না। বৈদেশিক রীতিনীতিতেই তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন। এই অভাব পূরণের জন্য স্বাধীনতার চার বৎসর পর ১৯৫১ সালে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরূপ একটি শক্তিশালী ও বিকল্প রাজনৈতিক ধারা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত দীনদয়াল ছিলেন একজন প্রকৃত ভারতীয় চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক ও রাজনীতিবিদ। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপন করিলে তিনি তাহার সাধারণ সম্পাদক এবং পরে সভাপতির দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার নিকট যদি আরও একজন দীনদয়াল থাকিত তাহা হইলে আমি ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিতাম।' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হইবার কারণে মাতৃভূমির সেবা ব্যতীত তাঁহার মনে অন্য কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না।'

ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান হইল 'একাত্ম মানবদর্শন'। এই দর্শনের মূলকথা হইল, প্রথমত, মানুষের বিকাশ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অথবা শারীরিক নহে, শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সামগ্রিক বিকাশ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি ও সমাজ দ্বন্দ্বমূলক নয়, তাহা পরস্পরের পরিপূরক। তাহাদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। তৃতীয়ত, 'ধর্ম' কোনো উপাসনা পদ্ধতি নহে, ইহা মানুষের অভ্যন্তরস্থ নৈতিক নিয়ম বা কর্তব্যের বোধ। এই বোধ সমাজকে সূত্রবদ্ধ রাখিতে সাহায্য করিয়া থাকে। চতুর্থত, সমাজের একেবারে অন্তিম পঙ্‌ক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকা, সর্বাপেক্ষা পশ্চাদপদ দরিদ্র মানুষটিরও কল্যাণ ও উত্থান নিশ্চিত করা। পঞ্চমত, প্রকৃতিকে শোষণ না করিয়া যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে। এই দর্শনের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির জ্ঞান পরম্পরা হইতে প্রশাসন পরিচালনার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে, তাঁহার একাত্ম মানবদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির মূল ধারা পরিচালিত হইতে শুরু করিয়াছে। এই দর্শনের মাধ্যমেই ভারত পুনরায় বিশ্বগুরুর আসনে আসীন হইতে চলিয়াছে। ভারতীয় রাজনীতির শুদ্ধীকরণের এই প্রকার পথ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মনঃপূত ছিল না। ১৯৬৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ট্রেন যাত্রাকালে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু বিশ্ববাসী আজ প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, তাঁহাকে হত্যা করিয়াও তাঁহার দর্শনকে তাহারা স্তব্ধ করিতে পারে নাই। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি একজন দূরদর্শী ও পথপ্রদর্শক ব্যক্তিত্ব হিসাবে ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথেই বর্তমান ভারত জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে।

সুভাষিতম্

সুব্যাহৃতানি ধীরাণাং ফলতঃ পরিচিন্ত্য যঃ।
অধ্যবস্যতি কার্যেষু চিরং যশসি তিষ্ঠতি।। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব)

অর্থ ঃ বিবেকবান ব্যক্তির উপদেশগুলিকে বিচার বিবেচনা করে নিষ্ঠা সহকারে যে ব্যক্তি কোনো কাজ শুরু করেন, তাঁর কীর্তি এই সংসারে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

তোরা কবি গাইবি আর পয়সা নিবি তোষামোদির কী কারণ!

‘লাল পতাকা আজও লজ্জার পতাকা’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

প্রায় ৪০ বছর আগে (১৯৮৬-৮৭) এক বর্ষীয়ান লেখক ‘লাল পতাকা লজ্জার পতাকা’ নামে একটি উত্তর সম্পাদকীয় লিখে বিদেশি বামপন্থীদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। খোকা বিপ্লবী মাওবাদীরা তাদের নেতা মহাদেব মুখার্জির নেতৃত্বে সে কাগজ আক্রমণ করে। গোছা গোছা সংবাদপত্র জ্বালানো হয়। আগমার্কা বাম ও অতিবামপন্থীদের এটাই প্রতিবাদের ধরন। বামবিরোধী কাগজ হিসাবে উঠে আসা সেই পত্রিকা পরে এরাজ্যে ১৫ বছর ক্ষমতাসীন তস্কর, জেহাদি সরকারের তাঁবেদারে পরিণত হয়। পোষা সাংবাদিকদের দিয়ে সরকারের মনোরঞ্জন চালায়। তারও আগে ১৯৮৪ সালে এক বহুল পরিচিত বাংলা দৈনিককে ৫৪ দিনের জন্য ব্লকেড বা অবরোধ করে বাম ইউনিয়ন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাদের হয়ে মুখে ধান শুকালেও সে ব্লকেড বা অবরোধ তোলার সাহস দেখাননি। বাম গুন্ডাদের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে অবরোধ ভাঙেন পত্রিকার সাংবাদিক ও কর্মীরা। সে কাগজে এখন শোনা যায় কালচারাল মার্ক্সিস্টদের পদধ্বনি। তারা ভারতীয় সংস্কৃতি-বিরোধী একটি ভাড়াটে আর ধার করা মতাদর্শ সৃষ্টি করতে চায়। এই ভাড়াটে সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই জেতা সহজ না হলেও জেতা যাবে না এমনটা নয়। গায়ের জোরে বা পশুশক্তির পেশির আস্ফালনে তাকে খাঁচায় ভরা দুষ্কর। তার জন্য তাদের মানসিক পরিধি ভাঙা প্রয়োজন। এই সাংস্কৃতিক সংগ্রাম মাংসপেশির নয়। বুদ্ধি আর কৌশলের।

রাজ্যপাটে বহুবার লেখা হয়েছে যে, উপায় বা কৌশল দিয়ে যা হয়, পরাক্রমে তা হয় না। ভোলা ময়রার গান ছিল— ‘কবি গাইবি পয়সা নিবি তোষামোদির কী কারণ / কেমন করে বললি জগা জাড়া গোলোক বৃন্দাবন / এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা চৌদিকেতে বাঁশবন।।’ ধারণাটি প্রায় উঠেই গিয়েছে। সবাই নিজের কোলে ঝোল টানতে চায়। বিগত ৪৯ বছরে এরাজ্যে দুই শাসকের ‘শাসক আইন’ বলবৎ হওয়ার পাশাপাশি সরকারি মদতে শাসকের ইতিহাসও লেখার চেষ্টা হয়েছে। তাই তেলেঙ্গানা বা তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস পড়ানোর পাশাপাশি তথাকথিত জমি আন্দোলন সিঙ্গুরের তৈরি করা লড়াইয়ের ইতিহাসও স্কুল পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিদেশি সিপিএমকে একপ্রকার পদাঘাত করেই রাজ্য থেকে উৎখাত করেছিল পরবর্তীতে তৈরি হওয়া তস্কর ও জেহাদিদের সরকার। এখন তাদের সঙ্গেই সখ্য স্থাপন করে আরও চরম মাত্রার ভারত-বিরোধিতা তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। এরাজ্যে রাষ্ট্রবাদীদের আটকাতে তস্করদের সঙ্গে নিয়ে বামেরা জোট বাঁধছে। রাজনীতিতে এমন ঘটনা যে বিরল তা বলা যায় না। কারণ সুযোগ বুঝে নৌকো পাল্টানোর বহু উদাহরণ তাদের রয়েছে। পরিস্থিতির পছন্দসই ব্যাখ্যা করে তারা রাজনৈতিক অবস্থান পাল্টায়। যেমন ১৯৩৯ সালের ‘সাম্রাজ্যবাদীদের অভ্যন্তরীণ লড়াই’ ১৯৪১ সালে পরিণত হয় ‘জনযুদ্ধ’-এ! সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ‘বেবি পিসি’ বা ‘বেবি আন্টি’ বলে একটি নতুন জোট তৈরি নিয়ে মন্তব্য করেছেন। দুই হেরোর মিলন কেবল অন্ধকে অন্ধের পথ দেখানোর মতো। ওইভাবে পথ দেখাতে গিয়ে দু’জনেই খন্দে পড়ে। রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান নিয়ে বিরোধী দলগুলি হারিয়ে যায় নদীর চোরাস্রোতে।

যে সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে বিদেশি বামপন্থীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবাদীরা উত্তীর্ণ হয়েছেন, তা ভোটের রাজনীতির ভিন্ন পরিধিতে তৈরি। জনসাধারণের দ্বারা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন নির্বাচনে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে প্রায় ফাঁকা মাঠেই আপাতত আগামীদিনের ভোট জেতার লড়াই করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এরাজ্যে সামনের কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগম ও বিভিন্ন জেলায় পৌরসভা ভোটের পর ২০২৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে তার প্রমাণ হবে। এখন শাসক দলে অন্য দলের দুর্বৃত্তদের যাতে অনুপ্রবেশ না ঘটে তার দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। রাজনৈতিক অনুপ্রবেশকারীদের জন্য দরজা খোলা রাখার ভুল যে ভারতীয় জনতা পার্টি করবে না তা জোর দিয়ে বলা চলে।

লাল পতাকার ইতিহাস হলো ‘হিস্ট্রি অফ উইথড্রয়াল’ বা ‘পিছু হটার ইতিহাস’। ১৯৪০ সালের ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’কে প্রথমে প্রত্যাখ্যানের নাটক করলেও পরে তারা সমর্থন করে। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে তারা চীনের হয়ে ওকালতি করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে ‘কুইসলিং’ বা পরশক্তির দালাল বলে চিহ্নিত করে পরে তারা ‘ভুল’ স্বীকার করে! লালকৃষ্ণ আদবাণী কলকাতায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছিলেন যে, ভারতের কমিউনিস্টদের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলেছে। যা কিছু ভারত-বিরোধী— সেই সবকিছুই লাল পতাকার নীচে সৃষ্টি হয়। ২০০৮ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউপিএ-১ সরকারের উপর থেকে বামেরা সমর্থন তুলে নেওয়ার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— ‘চার বছর ধরে আমাদের সরকারকে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছিল।’ তাই এবার দেশজুড়ে সবপক্ষকে সাবধান থাকতেই হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

এত প্রেম কেন গো দিদি!

কমেডিয়ানেষু দিদি,

রাহুল গান্ধী খুব মজেছেন নেহা বোরার প্রেমে। শুনলাম দিদি, নকশালের সঙ্গে রাহুলের পিরিত দেখে নাকি আপনি রাহুলের মা সোনিয়া পিসিকে নালিশ করেছেন। মঞ্চে বসেই কানে কানে মন্ত্রণা দিয়েছেন যে, রাহুলের এত প্রেম ভালো নয়।

সবাই বলছে আপনি নাকি হিংসে করে বলেছেন। ওই যে রামলীলা ময়দানে আপনার ভাইপোকে পিছনের সিটে বসিয়ে রাখল আর মাইক দিলই না সেই জন্য রাগ। আর হিংসে কেন! কারণ, ওই মঞ্চে নকশাল নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের পরেও নেহা বোরাকে মাইক দিয়েছেন পাপ্পু রাহুল। এসব বলে যাঁরা আপনার নিন্দা করছে তাঁদের প্রতি আমার বক্তব্য, ভাইপোকে পাত্তা না দিয়ে কোথাকার কোন নেহাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হবেই-বা কেন! ভাইপোটা কতদিন কোনো মঞ্চে ওঠেনি। আগে গাড়ির ছাদে উঠে গরম গরম ডায়ালগ দিত। এখন তো ডিম থেরাপির ভয়ে কোথাও যায় না। খালি পুলিশ বা অন্য কেউ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকলে যায়। ও লোকসভায় দলের নেতা কিন্তু দলটাই নেই। আপনি দিদি খুব বড়ো গলায় বলেছিলেন, ১ নভেম্বরের ইন্ডি জোটের বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন প্রাণের ভাইপো। কিন্তু তার বদলে জুটল শুধু লাস্ট বেঞ্চ, সরি— চেয়ার!

তবে এটাও ঠিক দিদি, আপনি যেভাবে মাওবাদীদের সঙ্গে প্রেম করেছিলেন সেটা রাহুল গান্ধী পারবে না। ছত্রধর মাহাতোকে কাছে টেনে,বাইকে চেপে তারপরে সময় মতো ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু পাপ্পু কী সেটা পারবে! নেহা তো গিলে খাবে ওই শিশু ছেলেটাকে। হতে পারে বয়স হয়েছে, দাড়ি পেকেছে কিন্তু আদতে তো এখনো মায়ের আঁচলের তলায়। এখনো গায়ে দুধ বা সেরেল্যাকের গন্ধ লেগে। ওকে কন্ট্রোল করা দরকার। পিসি হিসেবে আপনার এটা কর্তব্য দিদি।

আসলে দিদি কংগ্রেসে দিমাগি নকশালের আধিপত্য চলছে। কংগ্রেসিরা নিজেরা কিছু ভাবতে পারছে না। তাই অন্যের কাঁধে হাত দিয়ে পথ চলতে চাইছে। কংগ্রেস যবে থেকে একই প্রোডাক্ট রাহুল গান্ধীকে বাজারে চালাতে চাইছে ততদিন থেকেই কংগ্রেসের এই দুরবস্থা। কার্যত, গান্ধী পরিবারটাই কংগ্রেসের কাছে বোঝা হয়ে গেছে। নেতা কম নেই কিন্তু গান্ধী পরিবারের বোঝা কাঁধ থেকে নামাতে না পারায় এখন কেউই আর এগোতে পারছে না। আর সেই বোঝা— রাহুল গান্ধী এখন নেহা বোরাদের প্রেমে পড়েছে। পিরিতের ঠেলায় দলটা যে আরও শেষ হয়ে যাচ্ছে তাতে হুঁশ নেই।

দিদি, আপনি যেভাবে মাওবাদীদের সঙ্গে প্রেম করেছিলেন সেটা রাহুল গান্ধী পারবে না। ছত্রধর মাহাতোকে কাছে টেনে, বাইকে চেপে তারপরে সময় মতো ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু পাপ্পু কী সেটা পারবে! নেহা তো গিলে খাবে ওই শিশু ছেলেটাকে।

আপনিও দেখলাম 'আমার নেত্রী' বলে সোনিয়া গান্ধীকে সম্বোধন করেছেন। শুধু তাই নয়, সেই তালিকায় মল্লিকার্জুন খড়্গে আর রাহুল গান্ধীকেও ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এখন শাসন কী করে করবেন বলুন তো! তবে দিদি আপনার এই ইয়েস পাপা, নো পাপা ছড়া হিট করে গিয়েছে। শুনছি এটা নিয়ে বলিউডে খুব তাড়াতাড়ি একটা মিউজিক ভিডিয়ো তৈরি হবে। সেদিন কিন্তু খুব মজা হবে দিদি। আজকাল রয়্যালিটির টাকা তো আর আসে না। তবে এটা থেকেও আসবে না। আসলে তো আপনি প্যারোডি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গোটাটা চটুল কমেডি হয়ে গিয়েছে। আপনার নামের সঙ্গে অনেক বিশেষণের মতো 'কমেডিয়ান'টাও জুড়ে গেল।

যাইহোক, দলের ভাইদের জন্য আগে অনেক ঘটকালি করেছেন। এখন তো ভাই নেই তো ঘটকালি কোথায়। তাই দেখুন রাহুল-নেহা প্রেমটা ভেস্তে দিয়ে ভাইপোকে টেনে তোলা যায় কিনা। আমার শুভেচ্ছা রইল।

নয়াদিল্লিতে এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে 'ভোট লুঠ' নিয়ে কমেডিয়ান হিসেবে আপনি বলেন, 'বাংলা এই এসআইআর প্রক্রিয়ার শিকার। তবু মাথা নত করব না। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য আমরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, লড়াইও চালিয়ে যাব।' এরপরেই বলেছেন, 'যাঁরা কাফের, তাঁরাই ভয় পান। আর যারা লড়াই করে, আখেরে তারাই ভয় পান। আর যাঁরা লড়াই করেন, আখেরে তাঁরাই জেতে।'

আমি না মানেটা ঠিক করতে পারিনি। এই রাজ্যে তো কাফেররা মানে হিন্দুরাই জিতেছে। নাকি ওটা ভুল খবর! ৪ মে, ২০২৬ কি চলে গেছে! নাকি এখনো সেটা ভবিষ্যৎ। ভোটের রেজাল্ট এখনো বার হয়নি? আপনি কি এখনো দুধের গাইদের নিয়ে ক্ষমতায়? সব গুলিয়ে যাচ্ছে দিদি!

অতিথি কলম



মহাদেবায় করদল্লী

বিভাজিত বিশ্বকে একত্রীকরণের উপায়

একাত্ম মানবদর্শন

একাত্ম মানবদর্শনের পথ ধরেই ভারতবর্ষ একদিন পৃথিবীকে নতুন রূপ দিতে সাহায্য করবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সমরসতায় জারিত করে সুষম ও স্থায়ী উন্নতির মাধ্যমে তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা পূরণ করে কীভাবে পরিপূর্ণ মানুষের জীবন যাপন করতে হয় তার পথ দেখাবে ভারতীয় দর্শন।

১৯৬৫ সালে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন--- তাতে তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুকরণ না করে ভারতীয় দর্শনের পুনরুদ্ধারের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। এই ঐতিহাসিক ভাষণে পণ্ডিতজী একদম নির্দিষ্ট করে ভারতীয় মূল্যবোধের কথাই বলেছেন; এই মতাদর্শকে তিনি 'একাত্ম মানবদর্শন' বলে উল্লেখ করেন। এটি কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক মতবাদ নয়, বরং পরিপূর্ণ মানবতার এক দর্শন। একজন মানুষকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য কতগুলো উপাদানের অবিভাজ্য একক বলা যেতে পারে। যেমন— 'শরীর' দৃশ্যমান উপাদান; 'মন' ও 'বুদ্ধি' অদৃশ্য উপাদান। অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি— এসব উপাদানের সমাহারেই একজন 'মানুষ' বলে পরিচিত হন। কাজেই একজন মানুষের অস্তিত্ব কখনোই কোনো বস্তুর চাহিদা বা আর্থিক চাহিদার উপর নির্ভর করেই শুধুমাত্র থাকতে পারে না।

ছয় দশক পরেও 'একাত্ম মানবদর্শন' আজও সমান প্রাসঙ্গিক। আমরা যে মহাজাগতিক সম্পূর্ণ শক্তি 'বিরাট'-এর কল্পনা করি— এই দর্শন তা থেকেই উদ্ভূত। 'চিতি' অর্থাৎ চৈতন্য হলো নীতি-নৈতিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি গুণাবলীর একটি সমষ্টিগত চেতনার প্রকাশ এবং এইসব মানবিক গুণের মাধ্যমেই একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়।

একটি 'রাষ্ট্র' মানে দেশ নামক কোনো ভূখণ্ড নয়। 'রাষ্ট্র' হলো মানুষের সংস্কার, সংস্কৃতি ও পরম্পরার একটি জীবন্ত রূপ। কিন্তু পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনায় দেশের সঙ্গে মানব সমাজের সম্পর্ক যেন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাহিদা পূরণের কিছু চুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে 'একাত্ম মানবদর্শন' শেখায় সমাজের মধ্যে সমরসতা (social harmony) বজায় রাখাটাই হলো 'ধর্ম'। ধর্ম মানে শুধু উপাসনাপদ্ধতি বা পূজার্চনার প্রক্রিয়া নয়। ভারতীয় ধর্মভাবনায় রয়েছে মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও তার অধিকারবোধের সঙ্গে তার কর্তব্যবোধের চেতনাও।

মানবসমাজে মানবিক সম্পর্কগুলি কতগুলো মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেমন— যম (চিরন্তন নীতিবোধ), নিয়ম (শৃঙ্খলাবোধ), প্রত্যাহার (চেতনাকে অন্তর্মুখী করা), অস্তেয় (চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা), সত্য (সত্যনিষ্ঠা, সত্যপরায়ণতা ও সততা), অহিংসা (হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা), সেবা (সেবাকার্য) ও দম (সংযম)।

সামাজিক আচরণে ধর্ম : দ্বাদশ শতাব্দীর ভক্তি আন্দোলনের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী, লিঙ্গায়েত সমাজের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সমাজ-সংস্কারক শ্রী বাসবেশ্বর মানবসমাজের জন্য কন্নড় ভাষায় যে 'বচন' দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই নীতিগুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন— 'কালা বেডা' অর্থাৎ অন্যের সম্পদে লোভ কোরো না। 'কোলা বেডা' অর্থাৎ অন্যকে শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত কোরো না বা হত্যা কোরো না। 'মুনিয়া বেডা' অর্থাৎ ক্রোধ কোরো না। 'হুসিয়া নুডিয়ালু বেডা' অর্থাৎ অসত্য কথা বোলো না। 'অন্যারিগে অসহিয় পাডাবেডা' অর্থাৎ অন্যকে কষ্ট দিও না। 'তান্না কন্নিসা বেডা' অর্থাৎ নিজের বড়াই কোরো না বা অহংকার কোরো না। 'ইদিরু আলিয়ালু বেডা' অর্থাৎ অন্যের সম্পর্কে কুকথা বোলো না।

অন্য একটি বচনে তাঁদের আরাধ্য দেবতা সম্পর্কে শ্রী বাসবেশ্বর বলেছেন— 'কখনোই বোলো না— তিনি কে? তিনি কে? তিনি কে? বরঞ্চ বলো--- তিনি আমাদের! তিনি আমাদের! তিনি আমাদের! হে পুত্রগণ বলো--- কুডালাসঙ্গমদেব; মানবরূপে তিনি আমাদের মধ্যেই রয়েছেন।' অর্থাৎ প্রতিদিনের সৎকর্মের মধ্যে মানুষের প্রতি

মানবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মধ্যেই 'ধর্ম' নিহিত রয়েছে। এর বিপ্রতীপে রিলিজিয়ন হলো একটি উপাসনাপদ্ধতি, যার মূল বিষয় হলো— একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং যাকে সেই উপাসকরা ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে মনে করে, তার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য।

বস্তুবাদের ওপারে : 'ক্যাপিটালিজম্', 'সোশ্যালিজম্' ও 'কমিউনিজম্'-এর মডেলগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে 'উৎপাদন' ও 'উৎপাদিত দ্রব্য' ভোগের প্রক্রিয়ার উপরে। তারা এই ধরিত্রীকে মানুষের ভোগ্যবস্তুর উৎস বলে মনে করে। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ হলো তাদের অর্থনৈতিক মডেলের একটি জীবিত উপাদান মাত্র।

দীনদয়ালজী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— এই চার পুরুষার্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। 'ধর্ম' মানুষকে শেখায় কীভাবে নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে, সামাজিক সমরসতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে, প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে জাগতিক সম্পদকে ভোগ করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ 'ধর্ম'কে এক কথায় ব্যক্ত করেছেন— 'ভালো হতে হবে, ভালো করতে হবে।' ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে 'ধর্ম' হলো— জীব হোক বা জড় পদার্থ, সবার মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান মনে করে তাকে সেই ভাবে সম্মান করা। তাই ভারতীয়রা পার্থিব ভূমিকে ভোগের বস্তু বলে মনে করেন না; তাঁকে সকল সৃষ্টির মাতা মনে করেন। তেমনই ভারতীয়দের বাসভূমি ভারতবর্ষ হলো তাঁদের মাতৃভূমি; একইভাবে ভারতবর্ষের নদী, বৃক্ষরাজি, গোবংশ হলো গঙ্গামাতা, বৃক্ষমাতা, গোমাতা।

এই ধর্মীয় নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থ সম্পদ আহরণ ও ভোগের বিষয়টিকে দেখতে হবে। 'অর্থ' অর্থাৎ ধনসম্পদ আহরণ বা ভোগের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের ধর্ম বা কর্তব্যও নীতি ও নৈতিকতা-আধারিত। ধনসম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে 'ধর্ম' যে নীতি ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয় তা

'সমগ্র বিকাশ' অর্জন করতে হলে, বিশ্বজনীন ভাবনা মাথায় রেখে প্রত্যেকের নিজের অঞ্চলের স্থায়ী উন্নতি ঘটাতে হবে।

বজায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে মানুষ এই পৃথিবীর মালিক নয়; প্রকৃতি মানুষকে পৃথিবীর জিম্মাদার বানিয়েছে যাতে তাকে ভালো করে দেখাশোনা করে রাখে। কাজেই এই পৃথিবী থেকে ধনসম্পদ আহরণ বা ভোগের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যেন এই পৃথিবীর জীব বা জড়বস্তু সবার প্রতি যথাযথ যত্ন ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়; সবার প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার সঙ্গে দেখতে হবে যাতে তাদের কোনো ক্ষতি না হয়। এই শিক্ষা পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যেতে হবে।

ভারতীয় জীবনশৈলী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এটি এমন একটি স্বয়ংশাসিত, স্বনিয়ন্ত্রিত ও নৈতিক জীবনপদ্ধতি যে মানুষ 'কাম' অর্থাৎ বাসনা-কামনা চরিতার্থ করার জন্য কখনোই পরিবেশগত ভারসাম্য বা প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে না, বরং সারা পৃথিবী জুড়ে প্রকৃতি বা পরিবেশের সুস্থিতি ও স্থায়িত্ব রক্ষার যে প্রয়াস চলছে— তার সঙ্গে পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ ভারতীয় ধর্মভাবনার মধ্যেই এই জীবনদর্শন রয়েছে। আর এভাবেই নৈতিক কর্মের মাধ্যমে ধর্ম পালন করতে করতেই চিত্তশুদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে তার চেতনার পরিপূর্ণ মুক্তি ঘটে হয় মোক্ষলাভ।

এইভাবে 'পুরুষার্থ'-এর ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমেই সকল ভারতীয় জীবনের চূড়ান্ত সত্য 'পরমার্থ'-এ পৌঁছাই।

বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে যাকে আমরা 'সুরাজ্য' বলি অর্থাৎ নৈতিকতা বজায় রেখে সুশাসন— ক্রমশই তার অবনমন ঘটছে। সেই পরিস্থিতিতে 'একাত্ম মানবদর্শন' উপস্থাপন করছে— 'স্বরাজ্য', 'স্বাবলম্বন', 'স্বদেশী', 'বিকেন্দ্রীকরণ' ও 'সামাজিক সমরসতা'র চিন্তাধারা। আগে রাজ্য রাজ্য শাসনের নীতিতে বলা হতো— 'যথা রাজা তথা প্রজা'। এখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বলা হয়— 'যথা প্রজা তথা রাজা'। অর্থাৎ প্রজা যেমন চাইবে, শাসক তেমনই করবেন। 'সমাজ আগে সত্তা পিছে'। অর্থাৎ সমাজই এখন শাসককে পরিচালনা করে। অর্থাৎ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা- অধিকার ইত্যাদিকে পূরণ করার লক্ষ্যেই রাজ্য বা দেশ কাজ করবে। অন্যদিকে মানুষ বা সমাজকেও আইন-কানুন মেনে তাদের নাগরিক কর্তব্যগুলো পালন করতে হবে। একজন নেতাকেও চিন্তায়-ভাবনায়, কর্মে-কর্তব্যে একজন সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা উন্নত মানের হতে হবে, এগিয়ে থাকতে হবে— মাথায় টুপি আর খাদি-কুর্তা পরে ঘুরে বেড়ালেই হবে না।

একজন নেতাকে স্বল্পমেয়াদি, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ না দেখে প্রকৃত অর্থে সুশাসন দিতে হবে। তাঁকে দেখতে হবে জনসাধারণ যাতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে পারে। আইন-কানুন যাতে সঠিক ভাবে রক্ষিত হয়। চারিদিকে যেন শান্তি-সুস্থিতি বজায় থাকে, মানুষ যাতে তাঁদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণগুলো স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে, মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা যেন বজায় থাকে; মানুষ যাতে দ্রুত বিচার পায় ইত্যাদি। 'নেতা' রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান হবেন, তবে অবশ্যই তিনি যেন স্বৈরাচারী না হয়ে ওঠেন।

মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে প্রযুক্তির প্রয়োগ : এখন একবিংশ শতাব্দী। পৃথিবী অনেকটাই প্রযুক্তি-নির্ভর হয়ে উঠেছে; এমনকী এসে গিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি। কিন্তু দেখতে হবে যে, আধুনিক

বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মানুষের নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদির যেন অবনতি না ঘটে। বিশেষত, মাইক্রোবায়োলজি, এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা), বায়োটেকনোলজি (জৈব-প্রযুক্তি), ডিজিটাল প্রযুক্তি ইত্যাদি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে এতে করে মানুষের একক সত্তা বা স্বাধীনতা, তার শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি টিকে থাকবে তো?

'একাত্ম মানবদর্শন' এক্ষেত্রে যে নীতির কথা বলে তা হলো— 'মানুষের বুদ্ধি যন্ত্রের নিয়ন্ত্রক হবে, যন্ত্র কখনোই মানুষের বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করবে না।' প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'লোক সংগ্রহ' নীতির কথা মনে রাখতে হবে যাতে সভ্যতার মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি বজায় থাকে; নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিও দৃষ্টি থাকবে স্বচ্ছ যাতে করে 'সৃষ্টি'র আনন্দ হারিয়ে না যায়।

পূর্ণতার জন্যই শিক্ষা : শিক্ষার প্রকৃত ও পবিত্র উদ্দেশ্য হলো মানবজীবনে পূর্ণতা প্রাপ্তির স্বাদ ও আনন্দ অর্জন করা। ভারতীয় শিক্ষার যে দর্শন, তাতে 'শিক্ষা'র অর্থ বর্ণমালা, শব্দাবলী, বাক্যগঠন ইত্যাদিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তাতে শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর, স্বাভিমানী ও একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে শেখায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন--- 'শিক্ষা হলো একজন মানুষের মধ্যে যে পরিপূর্ণতা রয়েছে তারই প্রকাশ।'

ভারতীয় জীবনশৈলী বলে— 'শ্রবণ' (মনোযোগ সহকারে শোনা), 'মনন' (প্রকৃতভাবে অনুধাবন করা), 'নিদিধ্যাসন' (ব্যবহারিক ও পরীক্ষামূলকভাবে জ্ঞানার্জন) ইত্যাদির প্রয়োগের মাধ্যমে সমগ্রের অর্থাৎ পূর্ণতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

ভারতীয় দর্শন বলে— মানুষের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে পঞ্চকোষের ক্রিয়ার মাধ্যমে। এই পঞ্চকোষ হলো— অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।

'শিক্ষা' হলো জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কারের সমন্বয়ে দেশ, জাতি, সমাজ উত্থানের লক্ষ্যে অনন্য অভিযাত্রা যা বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ 'শিক্ষা'র মাধ্যমেই মানবজীবন 'সমগ্র বিকাশ' প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সমরসতা : 'সমগ্র বিকাশ' অর্জন করতে হলে, বিশ্বজনীন ভাবনা মাথায় রেখে প্রত্যেকের নিজের অঞ্চলের স্থায়ী উন্নতি ঘটাতে হবে। পাশ্চাত্য দর্শনোদ্ভূত বস্তুবাদী সাম্যতা (বা সাম্যবাদ), কেন্দ্রীভূত যান্ত্রিক যৌক্তিকতা ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বিশ্বজুড়ে মানব সভ্যতার বিবিধতা হারিয়ে যায়। বিবিধের মাঝে মিলন সেখানে মহান হয় না। এর বিপ্রতীপে ভারতীয় দর্শন হাজার হাজার বছর ধরে বলে চলেছে— 'লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু।' অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সুখশান্তি সহকারে থাকুক।

বহুত্ববোধই হলো 'একাত্ম মানবদর্শন'-এর মূল শিকড়। দীনদয়ালজী প্রণীত এই দর্শনের মাধ্যমে পুনরুচ্চারিত হয় ঋগ্বেদের স্তোত্র— 'একম্ সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ 'সত্য' একটাই কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে তার ব্যাখ্যা করেন। একাত্ম মানবদর্শনের মাধ্যমে পুনরুচ্চারিত হয় মহা উপনিষদের বাণী--- 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ এই পৃথিবীর সবাই আমাদের আত্মীয়। এইভাবে সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানারকম বিবিধতা সত্ত্বেও আমরা ভারতবাসী ভারতীয় বিচারধারা অনুযায়ী সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল কামনা করি এবং তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করি। 'একাত্ম মানবদর্শন' বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন করছে— একজন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের যে সামগ্রিকতা রয়েছে, তাকে সকলে অনুধাবন করুন, স্বীকৃতি দিন, মানুষের 'বিশ্বরূপ'কে উপলব্ধি করুন। মানুষের সমাজ, তাঁদের সভ্যতায় যে বিবিধতা বিদ্যমান, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিশ্বজনীন সামাজিক সমরসতা গড়ে তুলুন। একাত্ম মানবদর্শনের পথ ধরেই ভারতবর্ষ একদিন পৃথিবীকে নতুন রূপ দিতে সাহায্য করবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সমরসতায় জারিত করে সুষম ও স্থায়ী উন্নতির মাধ্যমে তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা পূরণ করে কীভাবে পরিপূর্ণ মানুষের জীবন যাপন করতে হয় তার পথ দেখাবে ভারতীয় দর্শন; অর্থাৎ পুনরায় 'বিশ্বগুরু'র আসনে অধিষ্ঠিত হবে ভারতবর্ষ।

(লেখক একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

শোকসংবাদ



গত ২৯ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত জেলা সঙ্ঘচালক সুকুমার নাথ মহাশয় বারাসাতে অনুষ্ঠিত এবিআরএসএম-এর কার্যক্রম চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বেলা ১১.২৫ মিনিট নাগাদ পরলোকগমন করেন। সেদিন বিকালে তাঁর মরদেহ আনা হয় গোবরডাঙ্গা— জামদানী খাটুরার বাসভবনে। তারপর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা ও জামাতাকে রেখে গিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষকতা করতেন।

* * *



রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের মধ্যভাগের বিবেকানন্দ নগর কার্যবাহ অমিত ঘোষের বাবা নিমাই চন্দ্র ঘোষ গত ৩০ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর ২ নাতিও স্বয়ংসেবক। তিনিও প্রতিবছর গুরুদক্ষিণা সমর্পণ করতেন।

ফ্রান্সের বর্তমান সংকট এবং ভারতের ভাবনা

গণতান্ত্রিকভাবে সরকারে আসতে না পেরে এরা হতাশাগ্রস্ত। তাই মুষ্টিমেয় শহুরে যুবককে নিয়ে এরা দিল্লির রাস্তায় আন্দোলন করছে আর দাবি করছে রিজিম চেঞ্জের। ভারতের যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ, সাধারণ জনতা সবারই এ বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার।

ডঃ গৌতম কুমার মণ্ডল

ইউরোপের অত্যন্ত সমৃদ্ধ, উন্নত একটি দেশ ফ্রান্স। গত এক মাসের কিছু বেশি সময় ধরে সে দেশ চূড়ান্ত নৈরাজ্যের কবলে। ফ্রান্স দেশ আক্ষরিক অর্থেই জ্বলছে, পুড়ছে। রাজধানী প্যারিস-সহ লিয়ন, বর্দো ও আরও অনেক শহরে শুধু উত্তেজিত জনতার হিংসার ছবি। সামাজিক মাধ্যমে সেই অবারিত হিংসা আর নৈরাজ্যের ছবি আমরা দেখছি। বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শপিং মল, অভিজাত বিপণি এমনকী সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য, সৌধ, পৌর-দপ্তর সর্বত্র আগুন আর লুঠতরাজ। সারা দেশজুড়ে হিংসায় উন্মত্ত কোনো দৈত্য যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে। তার ধ্বংসলীলায় ছারখার হয়ে যাচ্ছে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যায় বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ ফ্রান্স।

ফ্রান্সের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাত কোটি। দেশটির ভৌগোলিক আয়তন ২ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গমাইলের বেশি। আয়তনের দিক দিয়ে ফ্রান্স ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। আয়তনে এর চেয়ে বড়ো শুধু রাশিয়া ও ইউক্রেন। ফ্রান্স প্রাচীনকাল থেকেই একটি নগর-ভিত্তিক দেশ। দেশটির মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ শহর নগরে বাস করে। প্যারিস ছাড়াও অন্যান্য প্রধান নগরগুলি হলো লিয়ন, বর্দো, মার্সেই, টুলুজ, নাইস, মন্টপেলিয়ে প্রভৃতি। এইসব শহর সারা বিশ্বের এক একটি বড়ো বড়ো বাণিজ্য কেন্দ্র। এ বিষয়ে প্যারিসের সুনাম সারা বিশ্বজুড়ে। কিন্তু বর্তমান নৈরাজ্য এই শহর নগরগুলিকেই সবচেয়ে বেশি গ্রাস করেছে। প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক এখন এই সব শহরের রাস্তায় রাস্তায় মুখে কালো কাপড় বেঁধে ঘুরছে। হাতে লাঠিসোটা, ইট পাটকেল, বোমা বারুদ। শুধুমাত্র প্যারিসের রাস্তাতেই দেড় লক্ষের বেশি এরূপ উন্মত্ত জনতা। এদের বেশিরভাগেরই বয়স তিরিশ চল্লিশের কোঠায়। এরা ছাত্র নয়, তাদের চেয়ে বয়সে বড়ো। যেহেতু তাদের বয়স কম, তাই তারা সামাজিক মাধ্যমে খুব সক্রিয়। সমাজমাধ্যমে এখন ফ্রান্সের হিংসার ভিডিয়োতে ভর্তি। এগুলো সারা বিশ্বে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। ফ্রান্সের যুব সমাজকে এইসব ভিডিয়ো হিংসায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করছে। আবার এইসব ভিডিয়ো বিদেশি ফান্ডিং আনতেও সাহায্য করছে।

ফ্রান্সে সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ শুরু হয়। খুব সাধারণ দু-একটি বিষয় থেকে। তা হলো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং স্কুলের সাধারণ পরিকাঠামোর অভাব এই নিয়ে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে সাধারণ ছাত্র বিক্ষোভ থেকেই প্যারিস শহরের নানা জায়গায় আন্দোলন শুরু হয়। তখন আন্দোলন একান্তই ছাত্র আন্দোলন ছিল। সেকেন্ডারি স্কুল কলেজের ছাত্ররা, যাদের বয়স উনিশ কুড়ি বছরের মধ্যে তারাই নিজেদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পরিকাঠামোর ন্যায্য দাবি দাওয়া নিয়েই আন্দোলনে নেমেছিল। ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শে চলা ছাত্র সংগঠন Union Communist Students এবং La France Insoumise নামের অন্য আর একটি ছাত্র সংগঠন প্যারিস শহরে ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। ক্রমশ এই আন্দোলন আর ছাত্র আন্দোলন থাকে না, তা দেশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। এখন ছাত্ররা এবং তাদের দাবি দাওয়া সব আড়ালে চলে গেছে।

ফ্রান্সের বিক্ষোভ এখন একটি আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাহেব বলছেন তিনি অনেক আগেই ফরাসি প্রেসিডেন্টকে তাদের অভিবাসন নীতি পরিবর্তন করতে বলেছিলেন, কিন্তু ফ্রান্স তা করেনি। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলছেন, প্যারিসের রাস্তায় যারা আন্দোলন করছে তারা আসলে হামাস আর আইসিস। ওদের সঙ্গে কোনো আলোচনা সম্ভব নয়, ওদের কঠোর হাতে দমন করতে হয়। নানা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমেও এই বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। ফ্রান্সের সরকার নিজেদের মতো করে তদন্ত চালাচ্ছে, এই নৈরাজ্যের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করছে। কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমও। এসব থেকে জানা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত ৫০টির মতো সংগঠন ফ্রান্সের

ফঃ ২

এই আন্দোলনের পিছনে আছে। এর মধ্যে ছাত্র সংগঠন ১৫টির মতো। বাকি সব বড়োদের সংগঠন। এর মধ্যে আছে রাডিক্যাল ইসলামিস্ট কিছু সংগঠন, বামপন্থীদের সংগঠন, কিছু শ্রমিক সংগঠন। ফ্রান্সে প্রচুর বিদেশি অভিবাসীর বাস। এদের সংখ্যা ২৫ লক্ষের বেশি এবং এরা বেশিরভাগই মুসলমান। মূলত এই মুসলমান অভিবাসী এবং বিভিন্ন বাম সংগঠন ফ্রান্সের বর্তমান আন্দোলনের পিছনে আছে। জানা যাচ্ছে এদের অর্থ আসছে নিউ ইয়র্ক ও চীন থেকে। ফ্রান্সের আন্দোলন এখন সে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে প্রতিবেশী অন্যান্য দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ছে। মুসলমান র‍্যাডিক্যাল গ্রুপ আর বামপন্থীরা মিলিত হলে একটি দেশের কী হতে পারে তা ফ্রান্সের বর্তমান ঘটনা পরম্পরা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে। জেহাদি মুসলমান ও বামপন্থী মতাদর্শে দীক্ষিত যুবকেরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অনেকে এখানে সেখানে বেঁধে দিচ্ছে প্যালেস্টাইনের পতাকা। এ থেকেই বোঝা যায় এরা কোন্ আদর্শে চালিত।

সাধারণ দাবি দাওয়া থেকে শুরু হয়ে ফ্রান্সের ছাত্রদের আন্দোলন এখন ছাত্রদের হাতের বাইরে। সে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হঠাৎ-ই এখন গভীর সংকটের মুখে। আন্দোলন এখন ফ্রান্সের সরকারের পদত্যাগ চাইছে। যদিও আর কয়েক মাস পরেই সে দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। সেই নির্বাচনেই তো গণতান্ত্রিক ভাবে রাষ্ট্রপতিকে সরানো যেতে পারে। সরকার বদলে যাবে। কিন্তু তারা সেই রাস্তায় হাঁটছে না। তারা অত্যন্ত সর্টকার্ট ভাবে সরকারের পরিবর্তন চায়। অর্থাৎ সরাসরি না বললেও দাবি সেই একই রিজিম চেঞ্জ। ইসলাম ও বামপন্থীরা যখন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে মেনে নিতে পারে না, তখন আন্দোলনের রাস্তায় গিয়ে রিজিম চেঞ্জ চাইছে। দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রের কাছে এ জাতীয় আন্দোলন এবং দাবি এক ভয়ঙ্কর সংকট হয়ে

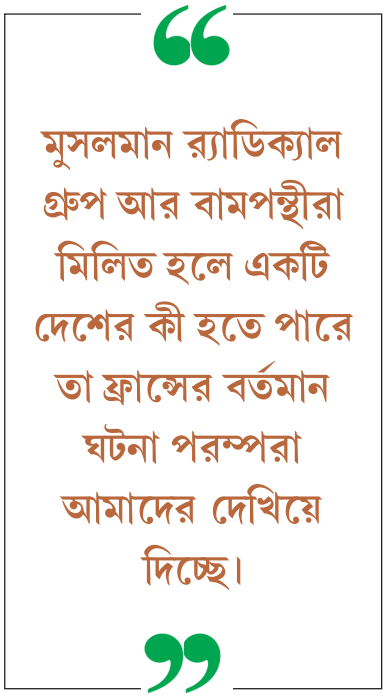

দাঁড়িয়েছে। নানা দেশে এরকম আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। ফ্রান্সের প্রতিবেশী দেশগুলো বিশেষ করে স্পেন, ইতালি, পর্তুগাল-সহ গোটা ইউরোপ তটস্থ। কোথাও কোথাও একই আন্দোলন শুরু হয়েছে। ইতালির শহর মিলানে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে। সে দেশের সরকার সেখানে সেনা মোতায়েন করেছে।

ফ্রান্সের বর্তমান ঘটনা থেকে ভারতের শিক্ষা নেওয়া দরকার। খুব সাধারণ দাবি নিয়ে এখানেও আন্দোলন শুরু হচ্ছে। হঠাৎ সামাজিক মাধ্যমকে অবলম্বন করে গজিয়ে উঠেছে এক নতুন দল ককরোচ জনতা পার্টি বা সিজেপি। এরা নাকি একেবারে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করে। এরা তাদের প্রথম আন্দোলন করল NEET-এর প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে। শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করলেন, এদের ক্ষমতা যেন বাড়ল। একটি সংবাদ পত্রের এক খবরের জেরে এরা দ্বিতীয় আন্দোলন শুরু করল। এবার দাবি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ। ককরোচদের ঘাড়ে চেপে বসল কংগ্রেস ও অন্য বিরোধী দলগুলো। দিল্লির রাস্তা অবরুদ্ধ হলো। সারা বিশ্বের কাছে এই খবর পৌঁছে দেওয়া হলো যে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। এস আই আর-এর নামে লক্ষ লক্ষ লোকের, আসলে বিজেপি বিরোধীদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং তার জন্যই বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গড়ে উঠেছে। তাই এইসব সরকার অবৈধ। সিজেপি-র বড়ো সঙ্গী রাহুল গান্ধী। তিনি নানা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখাচ্ছেন 'ভোট চুরি' হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ্ আর জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে এই ভিত্তিহীন কথা বলে এবং এখন সিজিপি-র ঘাড়ে চেপে সারা বিশ্বে ভারতের গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা হয়তো রাহুল গান্ধী তৈরি করে ফেলেছেন। এটাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

ভারতকে দুর্বল দেখতে চায় পৃথিবীর বহু দেশ এবং বহু গোষ্ঠী। এদের প্রচুর অর্থ। ভারতের এই জাতীয় আন্দোলনের জন্য এরা প্রচুর ডলার ব্যয় করতে পারে। কারণ ভারত দুর্বল হলে এইসব গোষ্ঠীর পোয়াবারো। ককরোচদের আন্দোলন তীব্রতা পেতেই বাংলাদেশে এদের সমর্থনে মিছিল বেরোচ্ছে। এদের নেত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলছেন বাংলাদেশের আন্দোলন থেকেই তারা পেয়েছে। এদের উকিল প্রশান্ত ভূষণ বলছেন তাদেরও মূল দাবি রিজিম চেঞ্জ। এদের সাংবাদিক যোগেন্দ্র যাদব আমেরিকা থেকে ঘুরে এসেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। গণতান্ত্রিকভাবে সরকারে আসতে না পেরে এরা হতাশাগ্রস্ত। তাই মুষ্টিমেয় শহুরে যুবককে নিয়ে এরা দিল্লির রাস্তায় আন্দোলন করছে আর দাবি করছে রিজিম চেঞ্জের। ফ্রান্সের বর্তমান ঘটনা এদের নিশ্চিত ভাবে উদ্বুদ্ধ করবে। আগামী দিনে হয়তো আরও কিছু দাবি নিয়ে এরা রাস্তায় নামবে। ভারতের যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ, সাধারণ জনতা সবারই এ বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। সরকার নিশ্চয়ই তার মতো করে ভাবছে এবং প্রস্তুতি নিয়েছে। □

জনমত হারিয়ে রেজিম চেঞ্জের ভরসায় এখন রাজনৈতিক বিরোধীরা

বিরোধীরা ভারতে রেজিম চেঞ্জ করতে চাইছে, কিন্তু এদের সামান্যতম ধারণা নেই যে হিন্দু সমাজকে কলুষিত করে ক্ষমতায় আসা তো দূরের কথা, উলটে কমিউনিস্টদের মতো রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে।

রঞ্জন কুমার দে

গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা অপরিসীম। নির্বাচিত সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে জনমত গঠন করে সরকারকে চাপে রাখাই বিরোধীদের প্রধান রাজনৈতিক কৌশল। রাজনীতিতে হার-জিৎ থাকতেই পারে, তবে প্রত্যেক পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই রাজনীতি। আগে ভারতীয় রাজনীতিতে আমরা দেখেছি সগৌরবে নিজের পরাজয় মেনে নিয়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত দলকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানানো এবং সঙ্গে বিরোধী নেতারা বলতেন তাঁরা নিজেদের পরাজয়ের কারণ ময়না তদন্ত করবেন। কিন্তু বিগত কয়েক বছর থেকে প্রায় সব বিরোধীরা ক্রমশ পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হতে এখন আর গণতন্ত্রে আস্থা রাখতে পারছেন না। জনগণের বিশ্বাস অর্জনের চেয়ে বিরোধীরা এখন আশ্রয় নিয়েছেন গুজব, ভুল তথ্য ও কুতর্কের উপর। এখন অনেক আসনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়ে, বিভিন্ন রাজ্যে সরকার গঠন করেও তাদের মনে হচ্ছে এই নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতিত্ব করছে; পরোক্ষভাবে তারা দেশের বৃহৎসংখ্যক ভোটারদেরই অবজ্ঞা করছেন। জনগণ এখন আর বোঝা নয়, বিরোধীরা নির্বাচনে জিতলে ইভিএম, নির্বাচন কমিশন ভালো আর হারলেই সব খারাপ, এমন শিশুসুলভ আচরণের দ্বারা তাঁরা নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা দেশের মানুষের কাছে বাঁচাতে চাইছেন।

বিরোধীদের অবশ্যই তাঁদের ভোটারদের কাছে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, তার মানে এই নয় যে তাঁরা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দেবেন। নির্বাচনে জিততে হলে অবশ্যই ভোটারদের রাজনৈতিক পালস্ বোঝা সবচেয়ে জরুরি। ভারতবর্ষের মতো বিশাল গণতান্ত্রিক দেশে মানুষের অনুভূতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। বিরোধীরা বিজেপি ও মোদীজীর বিরোধিতা ও সমালোচনা করতে করতে বুঝতেই পারেননি তাঁরা কখন যে নিজেরা দেশের প্রতি আনুগত্য হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে করতে এখন দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকেও রাজনীতির প্রতিপক্ষতা হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এখন পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁরা সেনাবাহিনীর কাছ থেকে প্রমাণ চেয়ে বসেন, জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গিরা সেনাদের উপর বিস্ফোরণ ঘটালে তাঁরা সেই ঘটনার নিন্দা না জানিয়ে তার মধ্যে সরকারের ভোটে জেতার রাজনৈতিক কৌশল খুঁজে পান। ভাবতেও অবাক লাগে, অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ভোটের জন্য এরাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতার বসাতে অনুমতি দেননি এতকাল কেন্দ্র সরকারকে। বাংলাদেশের জেহাদি রাজনৈতিক শক্তি বার বার ভারতের চিকেন নেক দখল করার হুমকি দিচ্ছে। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোয় স্থানীয় মুসলমানদের মদত এবং বাম-তৃণমূলের অবৈধ ভোট লিপ্সায় বাংলাদেশি ভোটারদের রমরমা।

শুধু অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমানরাই নয়, অজস্র রোহিঙ্গা, পাকিস্তানিরাও ভারতে



ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাই ভোটার তালিকা স্বচ্ছ ও সংশোধন করতে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এসআইআর চালু করেছে যার মাধ্যমে পর্যুদস্ত বিরোধী শিবির নতুন ফন্দি এঁটেছে যে--- প্রায় ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশে এই কিছু অবৈধ ভোটারদের সঙ্গে নিয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে তারা নির্বাচিত একটি সরকারকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলবে। তাদের কাছে ক্ষমতা এত প্রিয় যে প্রয়োজনে এই দেশবিরোধীদের ভোটার বানাতে তাদের কোনো দ্বিধা নেই। আগেও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবির বিগত বিহার বিধানসভায় এসআইআর-কে টার্গেট করে ভোট চুরির ক্যাম্পেন চালিয়েছিল, কিন্তু ভোটবাক্সে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। একই ধাঁচে মমতা ব্যানার্জির দল কলকাতার রাজপথের দখল নিয়েছিল এই অবৈধ ভোটারদের রক্ষাকবচ দিতে। কিন্তু জনতার রায়ে তাঁর দল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে ককরোচ আন্দোলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেখেছে দেশবাসী। তাই বিরোধীরা সেখান থেকে অক্সিজেন নিয়ে নতুন ফন্দি করে আবার এসআইআর-কে পেছনের দরজা দেখাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা চেয়ে বসেছে। যদিও কড়া হাতে দিল্লি পুলিশ এবং কেন্দ্র সরকার তাদের মুখোশ উন্মোচন করে ফেলেছে। ভারত যখন উৎসবের মেজাজে বিভিন্ন রাজ্যে ধর্মীয় সংস্কৃতি পালন করছে ঠিক সেই সময়ে ইউরোপের ফ্রান্স, ইতালি জ্বলছে। কারণটা একই সূত্রে গাঁথা। এযাবৎ উদাসীন সরকারি নীতি অবলম্বন করে লালকার্পেটে অভিবাসন নীতিতে সীমান্ত উন্মুক্ত করে এইসব অবৈধ অভিবাসীদের তারা আশ্রয় দিয়েছিল। আজ এরাই দেশগুলির ভূমিপুত্রদের জন্য বিপদস্বরূপ হয়ে উঠেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমি অনেক বছর আগে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁকে বলেছিলেন— আপনি অনেক বড়ো ভুল করছেন, সারা বিশ্বের লোককে ঢুকতে দিচ্ছেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ থেকে আসা মানুষদের অভিবাসন, যাদের হৃদয়ে ঘৃণা ভরা, সেই এক সময়ের মহান দেশটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আপার সীমান্ত বন্ধ করুন এবং নিয়ন্ত্রণ নিন, খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগে। ফ্রান্স থেকে উৎসাহিত হয়ে এই উগ্র সম্প্রদায় একই ধাঁচে ইতালিতে আন্দোলনের নামে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে প্রায় ১০ লক্ষ ইউরো ক্ষয়ক্ষতি করেছে।

তাই অভিবাসন সমস্যায় জর্জরিত ইতালি প্রেসিডেন্ট জর্জিয়া মেলোনি নতুন নিরাপত্তা আইনে বিক্ষোভ চলাকালীন জননিরাপত্তার জন্য— উপদ্রবকারীদের পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল এবং ২০ হাজার ইউরো পর্যন্ত জরিমানার আইন এনেছেন। ভারতে দেশবিরোধী চক্র এভাবেই দেশের সরকারি কাঠামোকে কোণঠাসা করার চক্রান্তে নীলনকশা সাজিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্র সরকারের বিচক্ষণতায় বিনা রক্তপাতে, জাতীয় সম্পদ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সকল প্রকার তথাকথিত আন্দোলন ভেস্তে যায়। এখন এক এক করে বিরোধী শিবিরের সব চক্রান্ত খালি চোখে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। বিরোধী শিবিরের অন্যতম উদীয়মান মুখ নেহা বোরা বলছেন, জেন-জি আন্দোলনে তাদের নাকি বাংলাদেশ পথ দেখিয়েছে। কিন্তু নেহারা হয়তো এটা স্টাডি করেননি যে বাংলাদেশ ও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনোভাবেই এক হতে পারে না। কারণ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা ১৭ বছর প্রায় বিনা ভোটে বিরোধীদের একঘরে করে শাসন চালিয়ে গিয়েছিলেন, তাই সেখানের এক বৃহৎসংখ্যক ভোটারদের মধ্যে একটা জনরোষ গড়ে উঠেছিল--- নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারার। কিন্তু ভারতের পটভূমি ভিন্ন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের মানুষের ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী জামাত শক্তিও রাজপথে এবং প্রকাশ্যে ভারতে একটা এরকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরিতে সময়ে সময়ে মদত দিয়ে আসছিল। দিল্লির যন্তরমন্তরের আন্দোলনে। আগামী নির্বাচনগুলোতে সম্ভাবনাহীন এবং রাজধানী দিল্লির ক্ষমতা হারিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালও মুঙ্গেরি লালের হাসিন স্বপ্নে বসবাস করছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, বাংলাদেশ ও নেপালের মতো উগ্র জেন জি আন্দোলনে ভারতের সরকার পড়ে যাবে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আন্দোলন দমনের জন্য কোনো রক্তপাতের আশ্রয় নেননি।

বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো বিজেপির কাছে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। একই অবস্থা প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসেরও। তারা আগামী নির্বাচনগুলোতে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া তোলা তো দূলের কথা ক্রমশ নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। তাই অকপটে স্বীকারও করে নিচ্ছে একমাত্র রেজিম চেঞ্জ ছাড়া বিজেপিকে সরানো সম্ভব নয়। রেজিম চেঞ্জ হলো— কোনো দেশের বর্তমান সরকার বা শাসন ব্যবস্থাকে জোর করে বা কৌশলে সরিয়ে দিয়ে নতুন সরকার বসানো। কিন্তু এই রকম পরিস্থিতি বর্তমানে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য সম্ভব নয় কোনোভাবে। কারণ এই সরকার গণতান্ত্রিকভাবে মানুষের ভোটে নির্বাচিত সরকার। এখানে গুজব ছড়িয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জনমত তৈরি সম্ভব নয়। ভারতে এখনও শ্রীলঙ্কার মতো অর্থনৈতিক সংকট আসেনি কিংবা বাংলাদেশের মতো অস্থির জেহাদি রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়নি, নেপালের মতো আন্দোলনকারীদের কোনো রক্তপাতও হয়নি। ২০২৭-এর প্রথমার্ধে উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন; অথচ এখন থেকেই উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব ভরা সভায় কর্মীদের শপথ বাক্য পড়াচ্ছেন, 'হিন্দু দেব-দেবীদের ঈশ্বর বলে মানি না'। সম্প্রতি রাহুল গান্ধীও বিভিন্ন উপায়ে বৃহত্তর সনাতনী সমাজকে হেয় করতে কোনো কার্পণ্য করেননি। তারা ভারতে রেজিম চেঞ্জ করতে চাইছে, কিন্তু এদের সামান্যতম ধারণা নেই যে হিন্দু সমাজকে কলুষিত করে ক্ষমতায় আসা তো দূরের কথা, উলটে কমিউনিস্টদের মতো রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে। □

দীনদয়াল উপাধ্যায় : জীবন, কর্ম ও একাত্ম মানবদর্শন

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক, সংগঠক, সাংবাদিক, লেখক এবং ভারতীয় জনসঙ্ঘের অন্যতম কার্যকর্তা। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে সাধারণত 'একাত্ম মানবদর্শন'-এর কথা বলা হয়। স্বাধীনতার পর ভারত যখন নিজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পথ নির্ধারণের চেষ্টা করছে, তখন দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক চিন্তার সন্ধান করেছিলেন। তাঁর জীবন দীর্ঘ ছিল না, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে সাংগঠনিক ও বৌদ্ধিক কাজ করে গিয়েছেন, তার প্রভাব পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্ম ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৬ সালে উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার নগলা চন্দ্রভান গ্রামে। তাঁর পিতা ভগবতী প্রসাদ ছিলেন রেলওয়ের কর্মচারী এবং মা রামপিয়ারীদেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। শৈশবেই তিনি পিতা-মাতাকে হারান। ফলে তাঁর শৈশব ও কৈশোর নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। আত্মীয়দের আশ্রয়ে তাঁর পড়াশোনা চলতে থাকে। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং পড়াশোনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কানপুরে পড়াশোনা করার সময় ১৯৩৭ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। সঙ্ঘ তাঁর জীবনের গতিপথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তীকালে তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হয়ে সমাজ ও সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪২ সালে দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রচারক হিসেবে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর অঞ্চলে তাঁর সাংগঠনিক কাজ শুরু করেন। প্রচারক হিসেবে তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ ও নিয়মানুবর্তিতাপূর্ণ। তিনি ব্যক্তিগত জীবনের আরাম-আয়েশের পরিবর্তে সংগঠন ও সমাজকর্মকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, কার্যকর্তা তৈরি, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে



দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতীয় জনসঙ্ঘের সাংগঠনিক বিস্তারে তাঁর ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি একাত্ম মানববাদের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শনের একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টাও তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বের অংশ।

সংগঠনের বিস্তার ঘটানো ছিল তাঁর প্রধান কাজ। এই সময়েই তাঁর সংগঠক-প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে সেই অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাজে লাগে।

তিনি শুধু সংগঠক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় লেখক ও সাংবাদিকও। ১৯৪০-এর দশকে তিনি 'রাষ্ট্রধর্ম' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরে 'পাঞ্চজন্য' সাপ্তাহিক ও 'স্বদেশ' দৈনিকের সঙ্গেও যুক্ত হন। লেখালেখির মাধ্যমে তিনি ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও জাতীয় জীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা প্রকাশ করতেন। তাঁর সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য ছিল কেবল সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়া নয়; বরং ভারতীয় সমাজের নিজস্ব ঐতিহ্য ও জীবনবোধের আলোকে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নকে বিচার করা। তাঁর লেখায় ভারতীয় সংস্কৃতি, সমাজের ঐক্য, জাতীয় চেতনা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে নানা আলোচনা পাওয়া যায়।

১৯৫১ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করলে দীনদয়াল উপাধ্যায় তার সাংগঠনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে উত্তরপ্রদেশে দলের সাধারণ সম্পাদক এবং পরে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এই সময়ে তাঁর প্রধান কাজ ছিল সংগঠনকে সারা দেশে বিস্তৃত করা, কার্যকর্তা তৈরি করা এবং একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা। তখন ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের ব্যাপক প্রভাব ছিল এবং জনসঙ্ঘ ছিল তুলনামূলকভাবে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন। এই পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন বিস্তার করা ছিল একটি বড় কাজ। দীনদয়াল উপাধ্যায় ধৈর্য ও দীর্ঘমেয়াদি সাংগঠনিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যান।

১৯৫৩ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর ভারতীয় জনসঙ্ঘের সামনে একটি বড় সাংগঠনিক সংকট তৈরি হয়। এই সময় দীনদয়াল উপাধ্যায় সংগঠনকে ধরে রাখার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মনে করতেন, একটি রাজনৈতিক দলের শক্তি শুধু নির্বাচনে সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; একটি আদর্শে বিশ্বাসী,

প্রশিক্ষিত ও সমাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীসমাজ গড়ে তোলাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দলের সাংগঠনিক ভিত শক্ত করার কাজে মন দেন। তাঁর এই কাজের ফলে ভারতীয় জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'একাত্ম মানবদর্শন'। স্বাধীনতার পর ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তায় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মতাদর্শের প্রভাব ছিল। সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, উদারতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে ভারত নিজের উন্নয়নের পথ খুঁজছিল। তিনি মনে করেছিলেন, ভারতের উন্নয়নের পথ নির্ধারণের সময় দেশের নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা ও জীবনদর্শনকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাঁর মতে, ভারতীয় সমাজের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ধারণাকে সরাসরি গ্রহণ না করে ভারতীয় অভিজ্ঞতার আলোকে একটি নিজস্ব পথের সন্ধান করা প্রয়োজন।

১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাইয়ে দীনদয়াল উপাধ্যায় একাত্ম মানবদর্শন নিয়ে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলিতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাকে সুসংবদ্ধভাবে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, মানুষকে কেবল অর্থনৈতিক জীব বা রাজনৈতিক নাগরিক হিসেবে দেখলে মানুষের সম্পূর্ণ সত্তাকে বোঝা যায় না। মানুষের দেহ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার মধ্যে একটি সমন্বয় রয়েছে এবং মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন বলতে এই সমস্ত দিকের সামগ্রিক বিকাশকে বোঝায়। ব্যক্তি ও সমাজকেও তিনি পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চাননি। তাঁর চিন্তায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বৃহত্তর মানবসমাজের মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে।

একাত্ম মানবদর্শনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর ধারণা। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি বা মানুষের ভোগক্ষমতা বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। মানুষের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক বিকাশও উন্নয়নের অংশ। এই কারণে তিনি অর্থনীতিকে মানুষের সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছিলেন। তাঁর চিন্তায় বিকেন্দ্রীকরণ, স্বনির্ভরতা, স্থানীয় উদ্যোগ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের জীবনকে উন্নত করা; শুধু সম্পদ সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য করা নয়।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তায় সমাজের পিছিয়ে থাকা ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব পায়। পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তার সঙ্গে 'অন্ত্যোদয়' ধারণাটি বিশেষভাবে যুক্ত হয়। অর্থাৎ সমাজের সর্বশেষ মানুষটির জীবনযাত্রার মনোন্নয়নকে উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে দেখা। এই ধারণার মধ্যে এমন একটি প্রশ্ন রয়েছে— দেশের উন্নয়নের সুফল সমাজের সবচেয়ে দুর্বল মানুষের কাছে কতটা পৌঁছাচ্ছে? তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে এই প্রশ্নের গুরুত্ব ছিল।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সংগঠন পরিচালনার ধরনও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির পরিবর্তে কার্যকর্তাকেন্দ্রিক সংগঠনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে সংগঠন মানে শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী কাঠামো নয়; বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই কারণে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বড় অংশ নির্বাচনী প্রচারের চেয়ে সাংগঠনিক কাজে ব্যয় হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে তিনি জৌনপুর লোকসভা উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু নির্বাচিত হননি। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি অবশ্য নির্বাচনী পদ নয়, বরং দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক ভূমিকা।

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেরলের কালিকট অধিবেশনে দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। বহু বছর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সংগঠন পরিচালনার পর তিনি দলের সর্বোচ্চ সাংগঠনিক পদে আসীন হন। কিন্তু এই দায়িত্ব তিনি দীর্ঘদিন পালন করতে পারেননি। ১৯৬৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বর্তমান প্রয়াগরাজ রেলস্টেশনের কাছে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন আলোচনা ও ব্যাখ্যা হয়েছে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ভারতীয় জনসঙ্ঘের কাছে একটি বড় আঘাত ছিল। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫১ বছর।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনকে বিচার করলে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে— একদিকে তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক নিষ্ঠা, অন্যদিকে একটি স্বতন্ত্র ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তা নির্মাণের চেষ্টা। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সাংগঠনিক ভিত তৈরি করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি মনে করেছিলেন, স্বাধীন ভারতকে নিজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার আলোকে উন্নয়নের পথ খুঁজতে হবে। একাত্ম মানবদর্শন ছিল সেই চিন্তারই একটি সুসংবদ্ধ রূপ।

পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জনসঙ্ঘ সূচনা হয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টি গঠিত হয়। বিজেপি পরবর্তীকালে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শনকে তার আদর্শগত ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে তাঁর চিন্তা শুধু তাঁর জীবদ্দশার রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতিতেও তা আলোচিত ও ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে দীনদয়াল উপাধ্যায়কে বুঝতে গেলে তাঁকে শুধু একজন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে দেখলে চলবে না। তাঁর জীবন ছিল একটি নির্দিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী সংগঠক, লেখক ও চিন্তকের জীবন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে একমত হওয়া বা না-হওয়া একটি পৃথক বিষয়; কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারত কীভাবে নিজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় নির্মাণ করবে— এই বৃহত্তর প্রশ্নে তাঁর চিন্তার একটি স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, অর্থনীতি ও উন্নয়ন এবং ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন তাই ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অল্প বয়সে পিতা-মাতাকে হারিয়ে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা এক মেধাবী ছাত্র থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন পূর্ণকালীন সমাজকর্মী, সংগঠক, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক চিন্তক। ভারতীয় জনসঙ্ঘের সাংগঠনিক বিস্তারে তাঁর ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি একাত্ম মানববাদের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শনের একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টাও তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বের অংশ। তাঁর জীবন আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন রেখে যায়; একটি স্বাধীন দেশের উন্নয়ন কি কেবল অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন, নাকি তার সঙ্গে মানুষের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক বিকাশও সমানভাবে যুক্ত? দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁর চিন্তার মাধ্যমে এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই সামনে আনতে চেয়েছিলেন। □

হিন্দুত্ব : সনাতনী ভারতবর্ষের চিরন্তন জীবনচর্যা

শাণিত শুভ্র ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষ কেবল একটি ভূখণ্ড নয়। এটি এক সুপ্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতার নাম। আজ অনেকে 'ধর্ম' ও 'রিলিজিয়ন'কে সমার্থক করে ফেলেছেন কিন্তু ভারতীয় দর্শনে ধর্মের অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিমি ধারণার চশমার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে দেখতে গিয়েই আসলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, 'হিন্দু' বা 'হিন্দুত্ব' কোনো নির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতি নয়। এটি এই পুণ্যভূমির সার্বজনীন পরিচিত এবং এক চিরন্তন জীবনচর্যা।

'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি মূলত একটি ভৌগোলিক বিষয়। 'হিন্দু' বলতে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীকে বোঝায় না। এটি সমগ্র ভারতের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। এই বিচারে, ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্ব আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

ভারতীয়দের এই জীবনচর্যা কোনো একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থ বা পূজাপদ্ধতিতে আটকে নেই। আমাদের উপনিষদকে অনায়াসেই সমস্ত দর্শনের জননী বা 'Mother of all Philosophies' বলা যায়, যা পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানচর্চাকে ছাতার মতো আশ্রয় দিয়েছে। উপনিষদের সেই শাশ্বত মহাবাক্য--- 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' (এই জগতের সবকিছুর মধ্যেই পরম সত্তা বিরাজমান)— প্রভাবিত করেছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশ্ববরেণ্য মনীষীকেও। তাঁর জীবনদেবতা ও কাব্যদর্শনের মূল ভিত্তিই ছিল ভারতীয় দর্শনের এই চিরন্তন সত্য। এই সত্যোপলব্ধি থেকেই তিনি গেয়ে উঠেছিলেন, 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।' বেদান্তের জ্ঞান কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুশাসন নয়, তা মানবজাতির চরম নৈতিক শিক্ষা। এই মাটির আবহমান সনাতনী ঐতিহ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে বাউল ও ভক্তি আন্দোলনের মতো লোকায়ত উদার সাধন-পরম্পরা, যেখানে বাহ্যিক সামাজিক আচারের চেয়ে মানুষের আত্মিক মুক্তি ও মানবপ্রেম প্রাধান্য পেয়েছে।

একইভাবে এই ভূমিতে চার্বাকের মতো নিরীশ্বরবাদী, জড়বাদী ও বস্তুবাদী দর্শনকেও পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। সেই মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা এই সনাতন জীবনধারায় ছিল।

ভারতীয় পরিচয়কে কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে আটকে রাখা চরম ভুল। অন্যান্য অনেক উপাসনা পদ্ধতি যেগুলির প্রবর্তক, প্রচারক ও অনুসারীদের মূল কাজ ছিল কেবল ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে যোগসাধন বা কিছু নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান শেখানো; সেখানে ভারতের মুনি-ঋষিদের কাছে 'ধর্মচর্চা'র প্রকৃত অর্থ ছিল— গভীর জ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান সাধনা। তাঁদের এই প্রজ্ঞাই প্রমাণ করে যে, 'হিন্দু' বা 'সনাতন' ভাবনা কোনো সাধারণ সংকীর্ণ 'রিলিজিয়ন' নয়। ভারতের প্রাচীন মনীষীরা চর্চা করেছেন গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, ভাষা ও চিকিৎসার বিষয়ে। মহর্ষি পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' আজও বিশ্বের সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ভাষা-ব্যাকরণ, যা আধুনিক কম্পিউটারের 'ব্যাকাস-নাউর ফর্ম' (বিএনএফ) ও প্রোগ্রামিঙের ভাষার গঠনরীতির সঙ্গে বিস্ময়করভাবে মিলে যায়।

পদার্থবিজ্ঞানে ও গণিতে প্রাচীন ভারতের মহর্ষি কণাদের পরমাণু তত্ত্ব, আর্যভট্টের শূন্য ও পাই-এর গাণিতিক ধারণা এবং পরবর্তীতে ব্রহ্মগুপ্তের শূন্যের ব্যবহারের অবদান ছাড়া আধুনিক গণিত ও প্রযুক্তির কথা কল্পনাই করা যেত না।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মহর্ষি সুশ্রুত পৃথিবীর প্রথম জটিল শল্যচিকিৎসা বা প্লাস্টিক সার্জারি করেছিলেন; চরক সংহিকা শেখায় সুস্থ জীবনের নিয়ম, চাণক্য রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির শিক্ষাদান করেছেন এবং মহর্ষি বাৎসায়নের কাজ মানবজীবনের মনস্তাত্ত্বিক নান্দনিকতার বিজ্ঞান ও জীবনশৈলীর বিকাশ। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মূল লক্ষ্যই ছিল অশুভ ও অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে বিশ্বময় সত্যের আলো ছড়ানো। আর তাই তাঁদের মূল আহ্বান ছিল— 'ওঁ অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।' (আমায় অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও।)

ভারতীয় সংস্কৃতির আরেকটি বড়ো সৌন্দর্য হলো এর বাস্তবমুখী ও বৈজ্ঞানির বিশ্ববীক্ষা। এখানে কোনো অলৌকিক বা পৃথিবীর বাইরের কাল্পনিক ঈশ্বরের সন্ধান করা হয়নি। ভারতীয় দর্শন বলে— 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। অর্থাৎ এই জগতের প্রতিটি জড় বস্তু ও প্রতিটি জীবের মধ্যেই সেই পরমব্রহ্ম বিরাজমান। ভারতীয় ঋষিরা ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ)— এই পঞ্চভূতের কথা বলে গিয়েছেন। জগৎ সংসারের প্রতিটি উপাদান এই পঞ্চভূত থেকে সৃষ্টি হয়, আবার লয়প্রাপ্ত হয়ে এই পঞ্চভূতেই ফিরে যায়। আধুনির বিজ্ঞানের পদার্থের রূপান্তর বা ব্ল্যাক হোল ও বিগ ব্যাং তত্ত্বের সঙ্গে এই প্রাচীন ভাবনার কী অপূর্ব সাদৃশ্য! এই পঞ্চভূত বা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই গড়ে উঠেছিল পরিবেশ রক্ষার আদি বিজ্ঞান। অথর্ব বেদের 'পৃথ্বী সূক্ত'-এ বিশ্বপ্রকৃতিকে মায়ের স্থান দেওয়া হয়েছে।

আজকের দুনিয়ায় মুক্ত জ্ঞান, পরিবেশ রক্ষা ও বিশ্বায়নের কথা খুব বলা হয়। অথচ হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে— 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বই একটি পরিবার। ঋগ্বেদে 'সংগঠন সূক্ত'-এ উচ্চারিত হয়েছে— 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং', অর্থাৎ সবাই মিলে একসঙ্গে চলো, সকলে এক সুরে কথা বলো, সকলের মন যেন পরস্পরকে একইভাবে উপলব্ধি করে, সকলে মুক্ত মনে জ্ঞান ভাগ করে নাও। এখন ইন্টারনেটের যুগে তথ্যের যে মুক্ত প্রবাহ সকলে দেখছে, তার আসল দর্শন, সেই একই কথা যখন বিদেশ থেকে নতুন নামে বা নতুন পরিচয়ে আসছে— তখন তাকে আমরা 'প্রগতিশীলতা' আখ্যা দিচ্ছি। অথচ এর জন্ম হয়েছিল এই ভারতবর্ষের মাটিতেই। এই কারণে 'হিন্দুত্ব' প্রকৃতার্থে একটি সম্পূর্ণ জীবন দর্শন। □

ককরোচ পার্টি, আন্দোলন ও কিছু প্রশ্ন

দেবদত্তা চক্রবর্তী

গণতন্ত্রে শুধু সরকারকেই প্রশ্ন করা যায় তাই নয়, বিরোধী দল তথা আন্দোলনকারীদেরও প্রশ্ন করা যায়। বিশেষত যদি সেই আন্দোলনকারীরা জনসাধারণের অধিকার, সংবিধান নিয়ে আন্দোলন করেন এবং জনগণকে সেই আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানান।

ককরোচ জনতা পার্টি। এই নামটির সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে সকলেই আজ পরিচিত। কিন্তু নামটির মধ্যে কোথাও যেন ব্যঙ্গ বা তির্যকতা আছে। একটি বৃহৎ ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল যার নামের সঙ্গে ভারতীয় কথাটি যুক্ত আছে, সেই দলের প্রতি যেন ব্যঙ্গ প্রকাশ করা হয়েছে মনে হয়। প্রশ্ন জাগে, এই ব্যঙ্গ কি শুধু একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে নাকি ভারতীয়ত্ব বা যা কিছু ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত তারও উদ্দেশে? আবার ককরোচ বা আরশোলা শব্দের সঙ্গে জনতা শব্দ যোগ করা হয়েছে। আরশোলাকে আমরা উপদ্রব বলেই মনে করি। ভারতের জনতাকে কি আরশোলার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে বা আরশোলা বলে অভিহিত করা হচ্ছে? কোথাও কি ভারতীয় জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব, বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীন সত্তাকে অপমান করা হচ্ছে? অর্থাৎ তাদের যা বোঝানো হবে তারা তাই বুঝবে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে না। আমরা জানি যে রাজনৈতিক দলগুলি চাঁদা তুলে নিজেদের ফান্ড বা 'পার্টি ফান্ড' গঠন করে। কিন্তু ককরোচ জনতা পার্টি নিজেদের কোনো রাজনৈতিক দল বলতে রাজি নয়, যদিও তারা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এই ককরোচদের ফান্ড কোথা থেকে আসে সেটা স্পষ্ট নয়। ককরোচ নেতারা অনেকেই বিমানবিহারী। যদিও তারা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের যারা অধিকাংশই কখনো বিমানে যাত্রা করেনি, তাদের অধিকার রক্ষার ঠিকা নিয়েছে। এই নেতাদের পেশা সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক্ এরা ছাত্র বা গবেষক। কিন্তু এদের বিমান বা অন্যান্য মাধ্যমে যাতায়াতের খরচ, রাজধানীতে থাকা-খাওয়া ইত্যাদি খরচ কি শুধু ছাত্র বা গবেষকের পক্ষে বহন করা সম্ভব? এরা অনেকেই দিল্লির বাইরে থেকে এসেছেন এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য দিল্লিতে থাকার প্রস্তুতি নিয়েছেন। যারা চাকরিজীবী তারাও কোনো বাড়তি খরচ করার আগে ভাবনা-চিন্তা করেন। কিন্তু ককরোচ আন্দোলনকারীদের সে চিন্তা নেই। কেন? বাংলাদেশি মুসলমানদের অনুপ্রবেশের ফলে জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে কোনো কোনো স্থানে। এই পরিবর্তনের প্রভাব এসেছে রাজনীতিতে। প্রকৃত ভোটারের অধিকার রক্ষা করতে নকল ভোটার চিহ্নিত করা অত্যাবশ্যক। জনবিন্যাস পরিবর্তন হলে হিন্দুদের ভাগ্যে কী ঘটে তা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান স্পষ্ট করে দেখিয়েছে। ককরোচরা এই নকল ভোটারদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না। অনুপ্রবেশকারীরা ভারতীয় জনসাধারণের উপর অত্যাচার করলে বা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করলেও এরা নীরব থাকে। সেই সময় সংবিধান লঙ্ঘিত হয় না? আমাদের জবাব চাই।

পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিন ধরে যে রাজনৈতিক দলগুলি অত্যাচার, নরহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরম সীমা অতিক্রম করেছে তাদের বিরুদ্ধে ককরোচরা একটিও কথা বলে না। কেন? চাকরি বিক্রির অভিযোগ, সাধারণ মানুষের বেহাল অবস্থা--- কোনোটাই সংবিধানকে ব্যহত করে না? ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয় অধিকারকে যে নেতারা পদদলিত বলে অভিযোগ করেছেন তারাই আজ ককরোচদের সমর্থক। ককরোচদের একমাত্র লক্ষ্য বিজেপি। কেন? বিরোধী দলগুলির ভয়াবহ অত্যাচার ককরোচদের চোখে ধরা পড়ে না? যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ভারতের জরুরি অবস্থার ইতিহাস জড়িত আছে, তারা একদিন ভারতীয় গণতন্ত্রের মর্মস্থলে আঘাত করেছিল, যে নেতা বলেছিলেন, 'এক দেশে দুই বিধান, দুই নিশান, দুই প্রধান চলবে না, চলবে না' তাঁকে বিনাবিচারে আটক করে তাঁর রহস্যমৃত্যু ঘটিয়েছিল, সেই পরিবারতান্ত্রিক দলটি আজ গণতন্ত্র বিপন্ন বলে কুমীরের অশ্রু বিসর্জন করছে। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে?

ককরোচরা সবচেয়ে বেশি কাদের প্রভাবিত করতে চায়? উত্তর হলো জেন জি-রা সদ্য তরুণ। দেশে ভবিষ্যৎ এই প্রজন্মের উপর নির্ভরশীল। এদের প্রভাবিত করতে পারলে এবং কোনোভাবে দেশবিরোধী পাঠ দিতে পারলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আঘাত করা যাবে। ককরোচরা আত্মপ্রকাশ করেছিল ছাত্রদের স্বার্থরক্ষায় আন্দোলন করে। কিন্তু ঝাড়খণ্ডে যখন ছাত্র আন্দোলন হলো তখন তারা ছিল অনুপস্থিত। কারণ কি সেখানে বিজেপি সরকার নেই? যেখানে বিজেপি সেখানেই আন্দোলন? তবে কি ধরে নেব যে ককরোচদের লক্ষ্য ছাত্রদের বা গণতন্ত্রের স্বার্থ নয়, এদের লক্ষ্য একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল? এরা কি মানুষের চোখে ধূলো দিতে গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার নাটক করছে? আমাদের জবাব চাই। নকল ভোটাররা ভোট দিলে ও জনবিন্যাসের পরিবর্তন হলে কাদের সুবিধা হবে, আমাদের জবাব চাই। দেশের মধ্যে অস্থিরতা হলে কাদের সুবিধা হবে?

সবশেষে প্রশ্ন ককরোচরা কেন নবরাত্রি ও আসন্ন দুর্গা পূজার সময় আন্দোলনের ডাক দিলেন? এই সময় দেশের বৃহৎ অংশের মানুষ নিজেদের ধর্মাচরণে ব্যস্ত থাকেন। আন্দোলনের ফলে তাঁদের অসুবিধা হবে না? নাকি সনাতন ধর্মের অনুসারীদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করা ককরোচদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। সদ্য তরুণরা আবেগমুক্ত হয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন, প্রশ্ন করতে শুরু করুন। কোনো কিছুকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন ভারতবর্ষকে মাতৃশক্তিরূপে কল্পনা করেছিলেন যে মাতৃশক্তির আরাধনা এখন সমগ্র ভারতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। □

মানুষের বিচিত্র আচরণ

মানুষের স্বভাব যে কত বিচিত্র প্রকৃতির হতে পারে, তার ইয়ত্তা নেই। আর মানুষের এই স্বভাব ও আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করাও আচরণগত অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রায়শই দেখি, সন্ধ্যার পর বাড়ির সামনে পাঁচিলের ধারে দু-চারটি আবর্জনা বোঝাই ক্যারিব্যাগ পড়ে রয়েছে। চতুষ্পদী প্রাণীদের কেউ কেউ 'সিন্ধু সেচে মুক্তো খোঁজার' আশায় সেই ক্যারিব্যাগ ফাটিয়ে আবর্জনা ছড়িয়ে দিয়ে যায় বাড়ির সামনে। পথচারীদের কেউ কেউ তখন বাড়ির গৃহস্থকে উদ্দেশ করে কটু ও কাটব্য করতে কার্পণ্য করেন না। অথচ কথায় বলে— 'দিন সবারই আসে।' সময়ের চাকা ঘুরবেই।

সেদিন সন্ধ্যার পর হেঁটে বাড়ি ফিরছি। দূর থেকে দেখলাম, এক ব্যক্তি সাইকেলে চড়ে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। বাড়ির সামনে এসে একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে জঞ্জালবোঝাই একটি ক্যারিব্যাগ পাঁচিলের ধারে ছুঁড়ে ফেললেন। চিৎকার করে বললাম, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান— কথা আছে।' কিন্তু তিনি সাইকেলের গতি বাড়িয়ে নিমেষে নাগালের বাইরে চলে গেলেন।

অর্থনীতির পরিভাষায় মানুষের এই আচরণকে 'নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি' বা নেতিবাচক বহিঃপ্রভাবের একটি সহজ সামাজিক উদাহরণ বলা যেতে পারে।

নিজের বাড়ির জঞ্জাল সরিয়ে ফেলার সুবিধা ব্যক্তি নিজে পেলেন বটে, কিন্তু সেই জঞ্জাল সরিয়ে ফেলার খরচ ও ঝামেলা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। দুর্গন্ধ, নোংরা পরিবেশ, সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং শেষপর্যন্ত পরিষ্কার করার দায়— সবই বহন করতে হবে অন্য কাউকে। অর্থাৎ একজনের ব্যক্তিগত লাভ, কিন্তু তার ক্ষতির বোঝা অন্যের।

এখানেই আসে 'কস্ট শিফটিং'-এর মতো বিষয়। নিজের কাজের খরচ বা অসুবিধা অন্যের ওপর ঠেলে দেওয়া আসলে কস্ট শিফটিং। নিজের বাড়ির সামনে থেকে জঞ্জালটি সরিয়ে ফেলতে পেরে ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে স্বস্তি পেলেন বটে, কিন্তু সেই স্বস্তির মূল্য দিতে হলো অন্য কাউকে।

আচরণগত অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো, মানুষ অনেক সময় তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত লাভকে ভবিষ্যৎ বা পরোক্ষ ক্ষতির তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেন। নিজের ঝামেলা এই মুহূর্তে কমলো— এই লাভটি তার চোখে পড়ে; কিন্তু অন্যের অসুবিধা, পরিবেশের ক্ষতি কিংবা পরে সেই জঞ্জাল পরিষ্কার করার সামাজিক ব্যয়টি তার কাছে যেন অদৃশ্য। তবে অন্যের ঘাড়ে খরচ চাপিয়ে দেওয়া মানেই খরচটি দুনিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল— এমনটা নয়। জঞ্জাল কোথাও না কোথাও থাকবেই। তার বোঝা কে বইবে?

—**অজয় ভট্টাচার্য,** পল্লিবার্তা রোড,
তালতলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।

খাওয়ার নিষিদ্ধ সময়

অথর্ববেদ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ খাওয়ার নিষিদ্ধ সময় নির্দেশ করেছে। কারণ, সূর্য পরোক্ষে অথচ মৌলিকভাবে আমাদের হজম ক্রিয়ার সহায়ক। সেইজন্য সন্ধ্যা সাতটার সময় খাদ্য গ্রহণ করার রীতি। পরে জলপান করা যেতে পারে। এর ফলে যে কোনো মারণ ব্যাধি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর তা না হলে মারণ ব্যাধিতে শরীর জর্জরিত হবে। রাত্রি দশটা-এগারোটায় সূর্য কোথায়? কতটা থাকে তখনও তার উত্তাপ। বর্তমান প্রজন্ম এসব ভাবছে না। অবৈজ্ঞানিক হলেও পরীক্ষা করে দেখে নিতে দোষ কী!

—**অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ,**
দেউলটি, হাওড়া।

আমার শাখা, আমার গ্রাম

১৯২৫ সালে বিজয়াদশমীর দিন মহারাষ্ট্রের নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। ১৯২৫ সালের যে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন সেটা আজকে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের বৃহত্তম অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে বিশ্ববাসীর নিকট সঙ্ঘের পরিচিতি। সঙ্ঘ শতবর্ষে সমগ্র হিন্দু সমাজে চৈতন্য সৃষ্টির জন্যে ৭টি কার্যক্রম নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ৬টি কার্যক্রম শেষ হয়েছে। শতবর্ষের অন্তিম কার্যক্রম 'আমার শাখা, আমার গ্রাম' অর্থাৎ প্রতিটি গ্রামে শাখা বিস্তারের যোজনা।

'সঙ্ঘ মানে শাখা, শাখা মানে কার্যক্রম। নিত্য মাঠে করবো মোরা হিন্দু সংগঠন'— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শাখার মাধ্যমে ব্যক্তি নির্মাণ করতে চায়। শাখার মাঠে যেমন শারীরিক হয় তেমনি বৌদ্ধিক হয়। অনুশীলন আর অনুশাসনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি যথাযথ কার্যকর্তা হয়ে ওঠেন। সঙ্ঘ ব্যক্তি নির্মাণ আর পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু উপযুক্ত রাষ্ট্রভক্ত মানুষ যদি দায়িত্বে না আসে তবে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সবচেয়ে কঠিন কাজ মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো, দীর্ঘদিন এরাজ্যে অপশাসন চলেছিল। অপসংস্কৃতি, দুর্নীতি, ধান্দাবাজ মানুষের রক্তে মিশে গেছে। জার্সি বদল করা সহজ কিন্তু মানুষের চরিত্র বদল করা, রাষ্ট্রভক্ত করে তোলা অনেক কঠিন। তাই 'আমার গ্রাম, আমার শাখা'গুলোতে আগে মানুষ তৈরি হোক। মানুষ রাষ্ট্রভক্ত হলে তবেই প্রকৃত পরিবর্তন আসবে।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোণা রোড, পশ্চিমমেদিনীপুর।

With Best Compliments From-

A

Well Wisher

রাজ্যের বিজেপি পরিচালিত সরকার ষান্মাসিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ

সুবল সরদার

রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরেছে। এক মানবিক ও সংবেদনশীল সরকারের রূপরেখা ফুটে উঠেছে, যার ফলে মানুষের মনে আস্থা ও ভরসা ফিরে এসেছে। সুস্থ, সুষ্ঠু, সুন্দর ও রক্তপাতহীন নির্বাচন উপহার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬-এর নির্বাচনে বসন্ত উৎসব পালিত হয়েছে।

হকারমুক্ত ফুটপাত ও রেলওয়ে স্টেশন হয়েছে। গ্রাম-শহর- কলকাতা জুড়ছে মেট্রো দিয়ে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ হয়ে তা মূল শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। সিলেবাসে আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস ফিরে পাচ্ছে। ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে— 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' রাবীন্দ্রিক ভাবনার অনুরণন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০ বছর পূর্তি দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জন্মভিটা-সহ পশ্চিমবঙ্গে নানা আঙ্গিকে স্মরণ করা হচ্ছে বন্দে মাতরমের গৌরবময় ইতিহাস।

১. সুশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা : রাজে আইনের শাসন ১০০ শতাংশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পুলিশকে রাজনীতিমুক্ত করে নিরপেক্ষ করা হয়েছে। তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটরাজ সম্পূর্ণ বন্ধ। প্রতিটি থানায় মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু।

২. কর্মসংস্থান ও যুব সমাজ : এসএসসি, পিএসসি, প্রাইমারি ও পুলিশ নিয়োগে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ শুরু হয়েছে।

গরিব প্রার্থীদের জন্য চাকরির ফর্মে কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি বা আবেদন ফি নেই। ওএমআর শিটে কারচুপি বন্ধ, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক পরীক্ষায় বসছেন। প্রতি জেলায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার চালু। স্টার্টআপ পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৫০০ কোটি টাকার তহবিল।

৩. শিল্প ও অর্থনীতি : বন্ধ চটকল ও চা বাগান খুলেছে, শ্রমিকরা কাজে ফিরেছেন। পদ্মফুলের সুবাসে বিনিয়োগ আসছে, টাটা ও ইনফোসিস নতুন লগ্নি করছে। সিঙ্গুরে নতুন শিল্প পার্ক এবং নদীয়ায় মাদার ডেয়ারি ও দই শিল্প তৈরির ঘোষণা।

৪. পরিবহণ ও যোগাযোগে বিপ্লব : শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ট্রামকে হেরিটেজ রেখে আধুনিকভাবে চালু করা হয়েছে। কলকাতা ও জেলায় নতুন ই-বাস-সহ পরিষেবার সংস্কার। মহিলা ও ছাত্রীদের জন্য বাস ভাড়া সম্পূর্ণ ফ্রি।

মহিলাদের জন্য মাসে ৩০০০ টাকা করে অন্নপূর্ণা স্কিম চালু হয়েছে। জলপথে ওয়াটার মেট্রো চালুর কাজ শুরু। বাগডোকরা, মালদা, বালুরঘাটে নতুন বিমানবন্দর এবং উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত ৪ লেন হাইওয়ে সম্পূর্ণ। রায়গঞ্জে এইমস এবং জলপাইগুড়িতে ক্যানসার হাসপাতাল ঘোষণা।

৫. সরকারি কর্মচারী ও অস্থায়ী কর্মীদের সম্মান : আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভাতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি। সিভিক ভলেন্টিয়ার ভিলেজ পুলিশদের স্থায়ীকরণের প্রক্রিয়া ও বেতন বৃদ্ধি। সরকারি কর্মচারীদের সমস্ত বকেয়া ডিএ মিটিয়ে হয়েছে। ৮ থেকে ১৫ বছরের বকেয়া ইনক্রিমেন্ট ও প্রমোশনের জিও প্রকাশ, যা কর্মচারীরা শীঘ্রই হাতে পাবেন। সপ্তম পে কমিশন খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে, কেন্দ্রীয় হারে বেতন কার্যকর হবে।

৬. স্বাস্থ্য ও শিক্ষা : সরকারি হাসপাতালে রোগীর খাদ্যের বরাদ্দ ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫০ টাকা করা হয়েছে। হাসপাতালে দালালরাজ বন্ধ, বিনামূল্যে উন্নত ওষুধের ব্যবস্থা। উত্তরবঙ্গে ২টি এআইআইএমএস-ও ৩টি ক্যানসার হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ। প্রতি জেলায় মেডিকেল কলেজের আসন বৃদ্ধি ও স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ।

৭. কৃষক ও মহিলা কল্যাণ : কৃষকদের পিএম কিষান ও রাজ্যের ভাতা একসঙ্গে প্রদান। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ১৫০০ থেকে বেড়ে ৩০০০ টাকা এবং মহিলাদের জন্য চাকরিতে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ। সর্বোপরি, সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের অন্ধকার দূর হয়েছে। রাজ্য ফিরে পাচ্ছে তার ঐতিহ্য। অভয়া থেকে নির্ভয়া— দিল্লি থেকে কলকাতায় মহিলারা আজ নির্ভয় পথচারিণী— 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ রণভূমে আর রণিবে না' তারা সকালে ধরা পড়ছে, বিকেলে খরচা হয়ে যাচ্ছে। বিলম্বিত বিচারের দায় তারা কেন বইবে? বিলম্বিত বিচারের দায় বিচার ব্যবস্থাকে নিতে হবে। কাশ্মীর থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ধর্মের পথ হেঁটে চলেছে। দুর্গাপূজা আর শুধু কার্নিভাল নয়, আশ্বিনের প্রাতে ঝরা শিউলি ফুলের গন্ধে, ঢাকের তালে আবার বোধন এসেছে। শরতের বাতাস এসেছে সুসময়ের উপহার নিয়ে। পাপ বিদায় করে, জঙ্গলরাজ মুক্ত করে সরকার এখন সংস্কারের পথে।



নারীবাদ
ভারতীয় প্রেক্ষিত

ডঃ শর্মিষ্ঠা ঘোষ

'নারীবাদ' শব্দটির উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যাবে এই শব্দটির জন্ম পাশ্চাত্যে। সত্যই নারীবাদী সকল আন্দোলন বিকাশ, বিস্তার পাশ্চাত্যের। এই প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে ভারতবর্ষের চিত্রটা তাহলে কীরকম? ভারতবর্ষের নারীদের স্থান কোথায়? ভারতবর্ষে এক সময় পরিবার ও সমাজে নারীর উচ্চ স্থান ছিল, শিক্ষার অধিকারও ছিল। ভারতবর্ষ প্রায় ১০০০ বছর পরাধীনতার অন্ধকারে জীর্ণ হয়েছে। এই পরাধীনতার ফলে ভারতবর্ষ তার নিজস্বতাকে অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে। তাই সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের নারীদের চার দেওয়ালে বন্দির যে চিত্র পাওয়া যায় সেটাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত চিত্র নয়। প্রাচীন ভারতে নারী শক্তিরূপে, মাতৃরূপে পূজিতা হতেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবুও ভারতবর্ষে সর্বত্র সর্বদা মাতৃত্বকে সম্মান দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্যে নারী একজন শয্যাসঙ্গিনী রূপে অবতীর্ণা। তাই স্ত্রী ও পুরুষের সম-অধিকার নিয়ে নারীবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীবাদ নিয়ে চর্চা হলেও, সেভাবে নারীবাদী আন্দোলন সাড়া পড়েনি। বরং পাশ্চাত্যের নারীবাদী চিন্তাকে অনুকরণ করে আজ অনেকেই দিগ্‌ভ্রান্ত। একটা কথা মনে রাখা খুব দরকার যে, পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী সংস্কৃতি গড়ে উঠে আর সংস্কৃতিগত চিন্তাভাবনা দ্বারা মানুষের প্রকৃতি গঠিত হয়। এক মানদণ্ড দ্বারা এই সব বিভিন্নতার বিচার করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলতে হয়, এক পরিবারের সমস্যা যদি পাশের পরিবারের অনুকরণে সমাধান করা হয়, তবে বিপত্তি ঘটবে। কারণ প্রত্যেক পরিবারের পরিজনদের মধ্যেকার সম্পর্ক আলাদা। প্রত্যেক পরিবারের নিজস্বতা থাকে। তবে পাশের বাড়ির কোনো ভালো চিন্তাভাবনাকে গ্রহণ করে, নিজের পরিবারের সম্পর্কের নিরিখে ছাঁচে ফেলে নতুন রূপে গড়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু অনুকরণের দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই পাশ্চাত্যের নারীবাদের ছাঁচ ভারতীয় নারীদের অস্ত্র হতে পারে না। ভারতবর্ষে নারীশক্তির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রানি রাসমণি, মা সারদামণি, রামসুন্দরী দেবী প্রমুখ যারা আধ্যাত্মিক শক্তির বলে বলীয়ান। তাই ভারতবর্ষের নারীশক্তির মূল সুর লুকিয়ে আছে আধ্যাত্মিকতায়, মাতৃত্বের আদর্শে।

মাতৃসাধনার ভাবনা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। পরাধীন দেশের সংকটময় সময়ে মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য দেশকে মাতারূপে আরাধনা করতে দেখা যায়। মাতৃত্ব সম্বন্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর মাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'মার জীবন তো স্বার্থময় নহে! যদি ভারতের ইতিহাস পড়েন তো দেখিবেন কত কত মা, ভারতমাতার সেবার জন্য জীবনযাপন করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সময়ে প্রাণও দিয়াছেন। দেখুন অহল্যাবাঈ, মীরাবাঈ, দুর্গাবতী— আর কত আছেন— আমার নাম মনে নাই। আমরা মাতৃস্তন্যে পুষ্ট— সুতরাং মাতৃ উপদেশ এবং মাতৃ শিক্ষা আমাদের যত উপকার ও উন্নতি করিতে পারে— আর কিছুতেই তত হয় না।' ভালোবাসা, ত্যাগ ও অনাশক্তির আদর্শ প্রতিমূর্তি হলেন মা। মাতৃত্বের এই আদর্শই মনকে শুদ্ধ, পবিত্র করে তোলে। যে আদর্শ দ্বারা নারী পূজিত হচ্ছে, সেই আদর্শ কি নারীর ক্ষমতায়নকে ক্ষুণ্ণ করে নারীকে ছোটো করতে পারে? কখনোই নয়, ভারতবর্ষে মাতৃত্বের আদর্শ, শক্তির আদর্শই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাই তো ভারতবর্ষে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মহান মনীষীদের পেছনে সর্বদা তাঁদের মায়েদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে নামাঙ্কিত থাকে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীশক্তির মাহাত্ম্য প্রস্ফুটিত হয় মাতৃত্বে আর মাতৃত্বসাধনার ভাবনা এই সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমান সময়ে এই ভাবনার বিকাশের প্রয়োজন। মাতৃত্বের আদর্শের সঙ্গে পবিত্রতা, নিঃস্বার্থ স্নেহ, ভালোবাসার আদর্শ যুক্ত, আর এই আদর্শ-ই সমগ্র সমাজকে যথার্থ বিকাশের পথ দেখায়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মাতৃত্বের এই আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নারী- স্বাধীনতা, নারীর সম-অধিকার, আন্দোলনের কোনো বিরোধী নয়। বরং বর্তমান সময়ে ক্যারল গিলিগান-এর 'কেয়ার বেসড এথিক্স' ভারতবর্ষের মাতৃত্বের আদর্শগুলি অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতবর্ষে মাতৃত্ব বলতে শুধুমাত্র গর্ভধারণকারিণীকে বোঝায় না, মাতৃত্ব ভারতীয় নারীর আদর্শ। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সকলের সত্যিকারের মা শ্রীশ্রীসারদা দেবী। এই মাতৃত্বের ধারণাই সমাজের হারানো মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনতে পারে। এই মাতৃকুলই পক্ষান্তরে সমাজ গঠনের কাণ্ডারি হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের এই মাতৃত্বের আদর্শ দ্বারা যেমন একটি সুস্থ সমাজ গঠিত হতে পারে, তেমনই নারীরা তাঁদের ক্ষমতায়নের পথেও অগ্রসর হতে পারে। তাই ভারতীয় প্রেক্ষিতে নারী আন্দোলনের যে মূলধারা, আদর্শ তার বিকাশ প্রয়োজন। যেখানে আছে পবিত্রতা, শুদ্ধতা, এক আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান নারীসমাজ। যথার্থ মাতৃত্বের ভাবনার বিকাশের মধ্যে দিয়েই নারী যেমন শিক্ষা, স্বাধীনতা, সম-অধিকারে অধিকারী হয়ে উঠে আধুনিক সময়ের আদর্শ বীর ভাবনায় নিজেকে নতুন ভাবে উন্মোচন করতে পারে, তেমনই শুদ্ধ-পবিত্র চিত্তে নিজেকে বিকশিত করতেও পারে। এই নারীই হবে প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুষ্ট আদর্শ আধুনিক নারী। □



বথুয়াশাকের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শরীরের জন্য খুব উপকারী

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

গ্রাম-বাঙ্গলার খুব পরিচিত একটি শাক হলো বথুয়া। অনেকে আবার একে বতুয়া বা বেথো বা বৈতে শাকও বলে থাকে। গ্রামাঞ্চলে এই শাক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আবার বাজারে আঁটি বেঁধেও বিক্রি হয়।

বথুয়া শাক শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী। এতে থাকা ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন 'এ', 'সি', আয়রন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফসফরাস, জিঙ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এই শাকে রয়েছে নানা ভেষজ গুণ। চলুন তাহলে জেনে নিই এই শাকের উপকারিতা :

হজমশক্তি বাড়ায় : বথুয়াশাকে থাকা পটাশিয়াম, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান হজম শক্তি বাড়ায়, রক্তাল্পতা প্রতিরোধ করে, চোখের রোগ কনজাংটিভাইটিস নিরাময়ে সাহায্য করে, মেয়েদের অনিয়মিত পিরিয়ড সমস্যা দূর করে। এছাড়া এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং জায়াটারি ফাইবার যকৃতকে ভালোভাবে কাজ করতে এবং মল নির্গমন প্রক্রিয়াকে সহজ করে।

হার্ট ভালো রাখে : বথুয়াশাকে পটাশিয়াম এবং সোডিয়াম থাকায় এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একই সঙ্গে শরীরে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। ফলে হার্ট ভালো থাকে এবং বিভিন্ন রকমের হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

পেটের অসুখ নিরাময় : পেটের বিভিন্ন অসুখ সারাতে দারুণ উপকারী এই বথুয়া শাক। পুরাতন আমাশয়ের মতো রোগে যারা ভুগছে, তাদের জন্য বথুয়াশাক খুবই কার্যকরী প্রাকৃতিক ওষুধ। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি ডায়রিয়া সারাতে এটি খুব দ্রুত কাজ করে।

দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় : ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ বথুয়া দৃষ্টিশক্তি এবং প্রতিষেধকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি কিডনি, হার্ট এবং অন্যান্য অঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।। এছাড়া রাতকানার মতো সমস্যাগুলো থেকে রক্ষা করে।

রক্ত পরিশোধক : বথুয়াশাক রক্ত পরিশোধক হিসেবে কাজ করে। এই শাকে হিমোগ্লোবিন স্তর উন্নত হয়। কারণ বথুয়ার প্রচুর আয়রন আছে, যা রক্তের হিমোগ্লোবিন স্তর উন্নত করার জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখে।

দেহ গঠন করে : বথুয়াশাক ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং জিঙ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান ধারণ করে, যা দেহ গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া এতে থাকা বিভিন্ন ভিটামিন আমাদের শরীর সুস্থ রাখে।

একই সঙ্গে দেহের কোষের ক্ষয় রোধ করে ও কোষকলার সুস্থতার সাহায্য করে। বথুয়া শাক অ্যামিনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ। এর পাতার মধ্যে আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে, যা আমাদের দেহ গঠনে সাহায্য করে।

শ্বেতি রোগ নিরাময় : ত্বকের শ্বেতি রোগ নিরাময়ে বথুয়াশাক দারুণ কাজ করে। এর জন্য চার কাপ বেথুয়াশাক, এক কাপ তিলের তেলের সঙ্গে ফুটিয়ে দিয়ে এক কাপ সমপরিমাণ করুন। প্রতিদিন একবার ক্ষত স্থানে মালিশ করুন। তবে পুরোপুরি এ রোগ সারতে কিছুটা সময় লাগবে। গরম জলে বা আগুনে ত্বক ঝলসে গেলে ওই স্থানে বথুয়াশাক বেটে লাগিয়ে রাখুন, জ্বালাপোড়া কমে যাবে।

প্রস্রাবে জ্বালা কমানো : প্রস্রাবে জ্বালা করলে আধা কেজি বথুয়াশাক বেটে, তিন গ্লাস জলে শরবত তৈরি করে ছেঁকে নিন। এরপর এতে তিন চা চামচ জিরা গুঁড়ো, তিন চা চামচ লেবুর রস মিশ্রিত করুন। দিনে তিনবার কয়েকদিন খেলেই এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

লিভারের সমস্যা : পিত্ত, মলাশয়ের সমস্যা দূর করে। মুখে ঘা হলে বথুয়াশাক চিবিয়ে খেলে বা রান্না করে খেলে ঘা সেরে যায়। কিডনিতে পাথর হলে প্রতিদিন ১ কাপ বেথো শাকের রস খেতে পারলে উপকার পাওয়া যায়। □



ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে হাওড়া জেলার পাঁচারুলে বেঙ্গল শ্যুটিং বল চ্যাম্পিয়নশিপ

ক্রীড়া ভারতী হাওড়া জেলার উদ্যোগে এবং বেঙ্গল শ্যুটিং বল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় গত ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর জেলার পাঁচারুল শ্রীহরি বিদ্যামন্দিরে দুদিন ব্যাপী বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের ১২টি জেলা থেকে মোট ২৪টি মহিলা ও পুরুষ প্রতিযোগী দল অংশগহণ করে। দুদিন ব্যাপী এই শ্যুটিং বল প্রতিযোগিতায় সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর হাওড়া বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার এবং জেলা সম্পাদক সুরজিৎ মান্না,রাজ্য ক্রীড়া ভারতীর বিশিষ্ট পর্বতারোহী এভারেস্ট বিজয়ী মলয় মুখার্জী। এছাড়াও ইস্ট জোনের শ্যুটিং বল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিনয় কুমার সিংহ, বিহার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য গৌতম অধিকারী এবং রাজ্য সম্পাদক রাজেশ পলাশ পাত্র উপস্থিত ছিলেন।

দুদিন ব্যাপী শ্যুটিং বল প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলার মহিলা ও পুরুষ বিভাগের দল প্রথম স্থান অধিকার করে। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হাওড়া জেলা ক্রীড়া ভারতীর সম্পাদক সুরজিৎ মান্না ও তাঁর সহযোগীরা।

সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে পুরুলিয়া শহরে সংস্কৃতামৃতমহোৎসব



সংস্কৃতভাষাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাকে জনমুখী করার উদ্দেশ্যে গত ২০ সেপ্টেম্বর সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে পুরুলিয়া শহরের গাড়িখানার 'আপন ঘর আশ্রম'-এ সংস্কৃতামৃতমহোৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন পূর্বতন প্রধান শিক্ষক আনন্দমোহন মণ্ডল। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় প্রশিক্ষণ প্রমুখ শ্রীরাম মহাদেব। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতভারতীর প্রান্ত অধ্যক্ষ ডঃ তন্ময় ভট্টাচার্য এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতভারতীর পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ, পুরুলিয়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী নিত্যশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ও রঘুনাথপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী যোগযুক্তানন্দজী মহারাজ।

এদিন সকাল ৯টায় এক সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শত শত সংস্কৃত অনুরাগী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত শ্লোক ও ধ্বনি উচ্চারণে এক অনন্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরিক্রমান্তে আলোচনাসভায় বক্তারা সংস্কৃতকে কেবল প্রাচীন বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ভাষা হিসেবে না দেখে একে আধুনিক যুগের উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দেন।

সকলের জন্য প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাও হয়। তাতে সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য নিদর্শন ও পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনী এবং শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত সংস্কৃতে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।





দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের বিশ্বকর্মা সম্মাননা অনুষ্ঠান

শ্রম, কর্মদক্ষতা ও সৃজনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর তপন থিয়েটারের দ্বিতীয় তলে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বকর্মা সম্মাননা অনুষ্ঠান। সনাতন ঐতিহ্যের বিশ্বকর্মাপূজাকে শ্রম ও কর্মের মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত করে তুলে ধরা হয় এক বিশেষ সামাজিক বার্তা। ভরত কুণ্ডুর অখণ্ড বন্দে মাতরম্ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ সুশান্ত মজুমদার, সম্পাদক মিলন খামারিয়া, সোমেটিকসের ফাউন্ডার এবং সিইও শান্তনু সোম, বিশিষ্ট সমাজসেবী কল্লোল দাস, চিত্রশিল্পী অভিজিৎ সরকার, তপন দেবনাথ, সুজাতা লাহিড়ী-সহ কলকাতার চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রশিল্পীরা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পেশা যেমন রাজমিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রি, গাড়ি সারাই মিস্ত্রি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশায় কর্মরত ৭৫ জনকে বিশ্বকর্মা সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাঁদের কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা ও সমাজে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। সৈকত মহন্ত ও কৃষ্ণেন্দু বেরা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্ঘমিত্রা মিশ্র-সহ বহু বিশিষ্ট শিল্পী। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সুমনা ভট্টাচার্য। ব্যবস্থাপনায় জীতা লাহিড়ী। সঞ্চালনা করেন ছন্দা হালদার ও শৈবাল সরখেল।

সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে আরামবাগ মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত সম্মেলন

সংস্কৃত ও সংস্কৃতির জাগরণের মাধ্যমে ব্যক্তি নির্মাণের উদ্দেশ্যে গত ২৪ সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার আরামবাগ মহাবিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কৃত সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন এলাকার আরও দশটি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং জেলার সংস্কৃতপ্রেমী মানুষেরা। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতভারতীর উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য বিষয়ে অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও সময়োপযোগী বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংস্কৃতভারতীর পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। অনুষ্ঠানে সংস্কৃত গান, স্তোত্র পাঠ, সংস্কৃত গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা। আগামীদিনে হুগলী জেলার আরামবাগ নগরে সংস্কৃতভারতীর কার্যবিস্তারের বিষয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করতে সাহায্য করেন সংস্কৃত বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ রুবেল পাল।





পুণ্যভূমি খলিসামারিতে রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন

গত ১০ সেপ্টেম্বর কোচবিহার জেলার পুণ্যভূমি খলিসামারির পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠ (উচ্চমাধ্যমিক) প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার ৯২ তম তিরোধান দিবস। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিল কোচবিহার জেলা ক্ষত্রিয় সমিতি। সহযোগিতায় ছিল কেন্দ্রীয় কমিটি এবং আয়োজনে ছিল পুণ্যভূমি খলিসামারি উদ্‌যাপন কমিটি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীআনন্দময় বর্মন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী দীপক বর্মন। বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং কোচবিহার পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য ডঃ নিখিলেশ রায়। এছাড়াও ছিলেন পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ডঃ মাধবচন্দ্র অধিকারী, ডঃ অমলকান্তি রায়, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ভবানীচরণ সিংহ, সম্পাদক প্রেমানন্দ অধিকারী, পঞ্চানন বর্মার নাতি তিমির কুমার বর্মা, উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা সকলেই পঞ্চানন বর্মার শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, স্বাভিমান ও সংগঠন চেতনার কথা তুলে ধরেন। উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং সমাজবোধ জাগরণে পঞ্চানন বর্মার ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাও আলোচনায় উঠে আসে।

দিনের দ্বিতীয় পর্বে আয়োজিত হয় ভাওয়াইয়া গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে প্রায় ১০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। বিপুল জনসমাগম এবং দর্শক-শ্রোতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে খলিসামারির অনুষ্ঠান মূলত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। পুণ্যভূমি খলিসামারিতে পঞ্চানন বর্মার তিরোধান উপলক্ষ্যে এই বিপুল জনসমাগম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে পঞ্চানন বর্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগের এক বহিঃপ্রকাশ হয়ে উঠেছে।

‘বহরমপুর ঝুলন প্রতিযোগিতা’-র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

ঐতিহ্যবাহী ঝুলন উৎসবকে পুনরুজ্জীবিত করতে গত ১২ সেপ্টেম্বর মহারাজা শশাঙ্ক স্মৃতিমঞ্চের উদ্যোগে বহরমপুর শুভদৃষ্টি কমিউনিটি হলে ‘বহরমপুর ঝুলন প্রতিযোগিতা-২০২৬’-এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ও লেখক ডঃ বিনয়ভূষণ দাশ।

প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী বিশ্বময়ানন্দ মহারাজ। ছিলেন সংস্থার সভাপতি ডঃ মৌসম সাহা, জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিংহ কলেজের অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ দত্ত, বিশিষ্ট ক্রীড়াপ্রেমী সুব্রত দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুদীপ্ত সাহা, শিক্ষিকা পল্লবী গোস্বামী প্রমুখ।





কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন

গত ১০ সেপ্টেম্বর ‘বন্দে মাতরম্’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি জাতীয় স্তরের অ্যাকাডেমিক আলোচনাসভা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর সভাগৃহে যৌথভাবে আয়োজন করে লোকপ্রজ্ঞা মধ্যবঙ্গ প্রান্ত, ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা (ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম) সেল ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। ‘বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর : জাতীয় জাগরণ, ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা এবং ভারতের সভ্যতাগত চেতনা’-শীর্ষক এই আলোচনাসভায় শিক্ষাবিদ, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন, ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও বিশিষ্ট অতিথিদের সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বিশিষ্ট গায়িকা শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা মিশ্র পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম্’ পরিবেশন করেন। আচার্য শ্রী সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ আশীর্বচন প্রদান করেন এবং অনির্বাণ মণ্ডল সংগঠন মন্ত্র পাঠ করেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কল্লোল পাল স্বাগত ভাষণ দান করেন। ‘বন্দে মাতরম্’-এর ১৫০ বছরের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, অ্যাকাডেমিক আলোচনায় ‘বন্দে মাতরম্’, ভারতের জাতীয় জাগরণ এবং দেশের সভ্যতাগত ও বৌদ্ধিক পরম্পরার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা হয়। এনআইটি ভোপালের ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রজ্ঞা প্রবাহের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য ড. সদানন্দ দামোদর সপ্রে ভারতে বিজ্ঞানের গৌরবময় পরম্পরা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। আধুনিক ভারতের ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরণের কাজে ও ভারতীয় ঐতিহ্য-পরম্পরা রক্ষায় ‘বন্দে মাতরম্’-এর কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক সপ্রে। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ডিন এবং লোকপ্রজ্ঞা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংযোজক ড. সোমশুভ্র গুপ্ত ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা বিষয়ে আলোচনা করেন। অন্যদিকে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে ‘বন্দে মাতরম্’-এর ১৫০ বছরের ঐতিহাসিক যাত্রা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আলোচনাসভায় স্মরণ করা হয়--- উনিশ শতকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং পরবর্তীকালে ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত ‘বন্দে মাতরম্’ কীভাবে ভারতের জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিল। আলোচনাক্রমে এর বৃহত্তর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এবং ভারতের সভ্যতাগত চেতনায় এর অবস্থানও বিশ্লেষণ করা হয়। আলোচনাসভায় শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। এদিনের আলোচনাসভায় তরুণ প্রজন্মকে ভারতের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করানো এবং ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা ও দেশজ জ্ঞান পরম্পরা বিষয়ে গভীর অ্যাকাডেমিক চর্চায় উৎসাহিত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। লোকপ্রজ্ঞার পক্ষ থেকে গৌরহরি চক্রবর্তী সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের এক যথার্থ ও অনুপ্রেরণাদায়ক সমাপ্তি হিসাবে সংস্কার ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রবীণ কার্যকর্তা ভরত কুণ্ডু ‘জনগণমন’ পরিবেশন করেন। এরপর শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে ‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এই তাৎপর্যপূর্ণ অ্যাকাডেমিক অনুষ্ঠান পরিসমাপ্তি লাভ করে।

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

বিবেকানন্দ পাঠচক্রের বার্ষিক সাধারণ সভা

উত্তর কলকাতার অগ্রণী সংগঠন বিবেকানন্দ পাঠচক্রের ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২০ সেপ্টেম্বর ১নং কৈলাস বোস স্ট্রিটস্থিত হটকেশ্বর ভবনে অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন পাঠচক্রের



সভাপতি কর্নেল সব্যসাচী বাগচী, সহ সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য ও গোপাল কুণ্ডু। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। সভায় কার্যকরী সমিতির সদস্য, সাধারণ সদস্য, উপসমিতির সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ী-সহ মোট ৮০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রাস্তাবিক ভাষণ প্রদান করেন গোপাল কুণ্ডু মহাশয়। সুকেশচন্দ্র মণ্ডল ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে তাঁর ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে জীবন গঠন করে দেশের জন্য কাজ করার কথা বলেন। সভাপতি কর্নেল বাগচী তাঁর ভাষণে বলেন, আজ স্বামীজীর কথা মতো 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' সত্যি বলে প্রমাণিত হচ্ছে এবং বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলিও তা স্বীকার করছে। সুভাষ ভট্টাচার্য বলেন, সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে 'আমি থেকে আমরা'তে উত্তরণ ঘটাতে হবে। অন্যের দোষ না দেখে আত্মশুদ্ধির বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। এরপর পাঠচক্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তথা অন্যতম উপদেষ্টা স্বর্গীয় তুষারকান্তি মজুমদার এবং স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সহ সম্পাদক স্বর্গীয় বাসুদেব পাল মহাশয়ের উদ্দেশে নীরব প্রার্থনা করা হয়। পাঠচক্রের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীভরত কুণ্ডুর কণ্ঠে অখণ্ড বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশনের পর উপস্থিত সদস্যরা একে একে পরিচয় প্রদান করে সংগঠনের সেবাকাজে তাঁদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এরপরে পাঠচক্রের কোষাধ্যক্ষ শ্রীশঙ্কর বাগ সমিতির নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন। সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুদীপ দত্ত ২০২৫-২৬ সালের কার্যবিবরণী পেশ করেন। এছাড়াও গ্রন্থাগার, চিকিৎসালয়, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যবিবরণী পেশ করেন উপসমিতির আহ্বায়করা। সভায় 'সংগঠনব্রতী' সম্মাননা প্রদান করা হয় শ্রীআনন্দ কুণ্ডু এবং শ্রী সর্বাণীপ্রসাদ দত্তকে সংগঠনে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করার জন্য। নতুন সাধারণ সম্পাদক রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীঅরুণেন্দু দত্ত।



পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

গত ২৫ সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘ ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের যৌথ উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয় 'একাত্ম মানব দর্শন' প্রণেতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ১১০তম জন্মবার্ষিকী। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশক্তি ও কর্মচারী-শক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে কর্মচারী সঙ্ঘ ও বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তাবৃন্দ। একাত্ম মানবদর্শন ও দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিকতা, বর্তমানে দেশ, জাতি, সমাজ গঠনে একাত্ম মানব দর্শন কতখানি প্রাসঙ্গিক— সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক ড. সুশান্ত মজুমদার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট সেক্রেটারি সঞ্জীব রায়, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট আহ্বায়ক শুভ্রজ্যোতি মণ্ডল ও বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা ও বিশিষ্ট আইনজীবী দীপ্তিমান রায়।

সুস্থ ও দায়িত্বশীল যুবসমাজ গড়ার লক্ষ্যে ‘আরোগ্য ভারতী’র আলোচনাসভা

গত ১৩ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটায় রাজাপুরে শ্রীজগন্নাথদেবের আশ্রমে সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে যুবসমাজের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভার



আয়োজন করা হয়। আরোগ্য ভারতীর বারাসাত সাংগঠনিক জেলার কিশোরাবস্থা প্রমুখ শ্রীমতী ভূমিকা দেবী এবং তাঁর টোলির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় মূল আলোচ্য বিষয় ছিল— সুস্থ জীবনশৈলী, নেশার ক্ষতিকর প্রভাব, যুবসমাজের উপর এর বিরূপ প্রভাব এবং নেশামুক্ত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা। আলোচনায় যুবসমাজের উপর সোশ্যাল মিডিয়া-র ভালো ও খারাপ প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত যুবক-যুবতীরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জে বি রায় আয়ুর্বেদ হাসপাতালের ট্রেনি ডাক্তার ওমপ্রকাশ গৌড়ায়, আরোগ্য ভারতীর পূর্ণকালীন কার্যকর্তা নীলকমল চক্রবর্তী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কিশোরাবস্থা প্রমুখ সন্দীপ দাস ও সাংগঠনিক কলকাতার মহানগরের পূর্বভাগের কিশোরাবস্থা প্রমুখ মনোজিৎ মণ্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতীর বারাসাত সাংগঠনিক জেলার কার্যকর্তাবৃন্দ।যুবসমাজকে নেশামুক্ত, সুস্থ ও সচেতন করে তোলার এই ধরনের উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ নির্বাহে শামিল হয়েছে আরোগ্য ভারতী। নেশামুক্ত যুবসমাজই পারে সুস্থ পরিবার, সুস্থ সমাজ এবং শক্তিশালী দেশ গড়ে তুলতে।



আরোগ্য ভারতী, দক্ষিণবঙ্গের সাংগঠনিক বৈঠক

গত ১৮ সেপ্টেম্বর আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মধ্য কলকাতা-স্থিত কেশব ভবনে। আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদক অশোক বার্ষ্ণেয়জী। এই বৈঠকে তিনি আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বিভিন্ন জেলার কাজের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনার পর উপস্থিত কার্যকর্তাদের বেশ কিছু মূল্যবান পরামর্শ দেন। বৈঠকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য সুনীলপদ গোস্বামীর উজ্জ্বল উপস্থিতি ও প্রেরণাদায়ক বক্তব্য সকলকে মুগ্ধ করে। এছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সংযোজক বুদ্ধদেব মণ্ডল, সহ-সংযোজক তথা অখিল ভারতীয় আরোগ্য মিত্র সহ-প্রশিক্ষক রাজেশ কর্মকার, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কার্যকরী সভাপতি জয়ন্ত সেন, সভাপতি ড. তুষারকান্তি মণ্ডল ও প্রান্ত-সচিব দিলীপ সরকার।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের ৯৮তম আত্মবলিদান দিবস উদ্‌যাপন

লাহোর কারাগারে বন্দিদের উপর ব্রিটিশের চরম অত্যাচারের প্রতিবাদে ৬৩ দিন অনশনের পর ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর আত্মবলিদান করেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস। গত ১৩ সেপ্টেম্বর বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী



বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের ৯৮তম আত্মবলিদান দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এদিন বিপ্লবী যতীন দাস স্মৃতি সমিতি-র উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগ ও কলকাতা পুরনিগমের সহযোগিতায় দক্ষিণ কলকাতায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে, যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে ও যতীন দাস পার্কে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। বিপ্লবী যতীন দাস স্মৃতি সমিতি-র সাধারণ সম্পাদক সুবীর কুমার কুণ্ডুর সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং সমিতি-র অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলকাতার তিনটি ভিন্ন স্থানে এই মহান বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এদিন কেওড়াতলা মহাশ্মশানে স্মারকবেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে, বিপ্লবী যতীন দাস স্মৃতি সমিতি-র সভাপতি তপন সিনহা-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন। এরপর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পর্ব অনুষ্ঠিত হয় যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী সুরেশানন্দজী মহারাজ, ঋষি অরবিন্দের পরিবারের সদস্য সৌরভ ঘোষ ও কলকাতা মেট্রো-র উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁদের উপস্থিতিতে এই পর্বটি এক বিশেষ মাত্রা পায়।

এদিনের মূল স্মরণ অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় যতীন দাস পার্কে। এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী যতীন দাস স্মৃতি সমিতি-র সভাপতি তপন সিনহা, সহ-সভাপতি সোমনাথ চন্দ্র ও কার্যকরী সভাপতি মিঠু চক্রবর্তী। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের সদস্য ও শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ও বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর ভ্রাতুষ্প্রপৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত, বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস, বিপ্লবী মেজর সত্য গুপ্তর ভ্রাতুষ্পুত্র অভিনব গুপ্ত, বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেনের কন্যা ড. পূরবী সেন, বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র শান্তনু মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট লেখক সায়ন্তন বসু, এম. মোহন, স্বামী তন্ত্র দেবানন্দ মহারাজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক গোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্টজন। বিশেষ অতিথির ভাষণে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর পৌত্র সুব্রত চাকী বলেন, শুধুমাত্র কয়েকজন বিপ্লবীর জন্মদিন ও প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে তাঁদের স্মরণ অনুষ্ঠান করলে হবে না। সারা বছর ধরে প্রত্যেক বিপ্লবীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রয়োজন। একমাত্র সেই প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বরেণ্য বিপ্লবীদের অবদান নতুন প্রজন্মকে অবহিত করা সম্ভব হবে। বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর ভ্রাতুষ্প্রপৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত বলেন, প্রাথমিক শ্রেণী থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে থাকা প্রয়োজন। নৃত্যানুষ্ঠান ও দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে দিয়ে মহান বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিপ্লবী যতীন দাস স্মৃতি সমিতি-র সাধারণ সম্পাদক সুবীর কুমার কুণ্ডুর কন্যা প্রজ্ঞা কুণ্ডু।

SURYA

Shaping Structures That Shape Tomorrow

Steel is what turns plans into lasting structures. Surya provides high-quality steel solutions that support construction, infrastructure, and development. Engineered for strength and consistency, they help projects move forward with confidence.

Because the future is built on what holds firm today.



SURYA HAI TOH BHAROSA HAI

Lighting | Wires and Cables | Professional Lighting | Fans | Appliances | Water Pumps | PVC and Water Tanks | Steel Pipes



I am SURYA | 50 YEARS OF TRUST | DURABLE PRODUCTS | ASSURED QUALITY

SURYA ROSHNI LIMITED | consumercare@surya.in | www.surya.co.in |

TOLL FREE 1800 102 5657



কাশী আজকের বারাণসী

এক জীবন্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ নগর

ডঃ জয়দেব বিশ্বাস

কাশী সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের (The Gospel of Sri Ramakrishna) একটি অসাধারণ অনুভূতির প্রকাশ পাওয়া যায় : 'Hearing about Banaras is different from reading about it; but seeing Banaras is different from either hearing or reading.' অর্থাৎ বারাণসীর কথা শোনা আর তা পড়া এক নয়; আবার বারাণসী নিজের চোখে দেখা-শোনা বা পড়া, দুটির থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা।'

আলোচনা যত এগিয়ে যায় তার পরতে পরতে এই বাণীরই প্রতিধ্বনি দেখা যায় আলোর স্পন্দনে। ভারতের ইতিহাসে এমন কিছু জনপদ রয়েছে, যেগুলি কেবল একটি ভৌগোলিক অবস্থান নয়; বরং একটি দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতার প্রতীক। সেই বিরল জনপদগুলির অন্যতম হলো বারাণসী, যার আর এক নাম কাশী। সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ ধরে এই নগর মানুষের বিশ্বাস, জ্ঞানচর্চা, শিল্প, দর্শন, সাধনা ও সংস্কৃতির ধারক হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর বহু প্রাচীন নগর সময়ের প্রবল স্রোতে হারিয়ে গেছে, অনেকগুলি আজ প্রত্নস্থল মাত্র। কিন্তু কাশীর বিশেষত্ব এখানেই— এটি আজও জীবন্ত। এখানে অতীত নিছক স্মৃতি নয়; বরং প্রতিদিনের জীবনযাত্রার একটি স্বাভাবিক অংশ।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কাশীর স্থান অনন্য। গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই নগরকে কেউ দেখেন তীর্থক্ষেত্র হিসেবে, কেউ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে। কাশীকে একমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করলে তার প্রকৃত পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। এই নগরের পরিচয় গড়ে উঠেছে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন জীবনপ্রবাহ, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং জ্ঞানের অবিরাম সাধনার মধ্য দিয়ে।

'কাশী' শব্দটির অর্থ নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। সংস্কৃত ধাতু 'কাশ' থেকে 'কাশী' শব্দের উৎপত্তি বলে বহু পণ্ডিতের অভিমত। 'কাশ' অর্থ— আলোকিত হওয়া বা দীপ্ত হওয়া। সেই অর্থে কাশী হলো 'আলোর নগর' বা 'জ্ঞান ও চেতনার আলোকময় জনপদ'। অন্যদিকে মনে করা হয় বরুণা ও অসি— এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে নগরটির অবস্থান থেকেই 'বারাণসী' নামের প্রচলন। ইতিহাসবিদদের মতে, এই ব্যাখ্যাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কাশীর উল্লেখ বহুবার এসেছে। বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্তর, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ এবং



বিভিন্ন পুরাণে কাশীর নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও এই অঞ্চলের গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে কাশী ছিল ভারতের ষোলোটি মহাজনপদের অন্যতম : 'বৌদ্ধ গ্রন্থ অঙ্গুত্তর নিকায় এবং জৈন গ্রন্থ ভগবতী সূত্র— এই প্রাচীন ভারতের যে ১৬টি শক্তিশালী রাজ্য বা 'ষোলোটি মহাজনপদ'-এর তালিকা পাওয়া যায়, তার মধ্যে কাশী অন্যতম প্রধান এবং সমৃদ্ধ জনপদ। এর রাজধানী ছিল বারাণসী। 'অর্থাৎ এটি শুধু ধর্মীয় কেন্দ্রই ছিল না; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও ছিল এক শক্তিশালী জনপদ।

ইতিহাসের ধারায় কাশীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর গ্রহণক্ষমতা। বহু শতাব্দী ধরে এখানে নানা ভাষার মানুষ, নানা সম্প্রদায়, নানা দর্শনের সাধক এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতিনিধি এসে মিলিত হয়েছেন। মতের ভিন্নতা ছিল, বিতর্ক ছিল, পরিবর্তনও ঘটেছে; কিন্তু সেই সব কিছুর মধ্য দিয়েই কাশী তার নিজস্ব চরিত্রকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এই কারণেই কাশীকে কেবল একটি ধর্মীয় নগর নয়, বরং ভারতীয় সভ্যতার সংলাপ, সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এক প্রাণসঞ্চারী উদাহরণ বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, বিখ্যাত মার্কিন কথাসাহিত্যিক মার্ক টোয়েন একবার বারাণসী প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'বারাণসী ইতিহাসের চেয়েও প্রাচীন, ঐতিহ্যের চেয়েও প্রবীণ, এমনকী কিংবদন্তীর চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ এবং এই সব কিছুকে একত্র করলে যা দাঁড়ায়, তার চেয়েও দ্বিগুণ প্রাচীন।' (মূল ইংরেজিতে উক্তিটি : 'Banaras is older than history, older than tradition, older even than legend and looks twice as old as all of them put together.' —'Following the Equator'-১৮৯৭) গঙ্গা এই নগরের প্রাণ। তবে গঙ্গা কেবল একটি নদী নয়; উত্তর ভারতের কৃষি, অর্থনীতি, জনজীবন, সাহিত্য, শিল্প এবং আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কাশীর ঘাটে দাঁড়ালে বোঝা যায়, নদী এখানে শুধু জলধারা নয়— এটি মানুষের জীবনযাত্রা, স্মৃতি, উৎসব, শ্রম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভোরের প্রথম আলো থেকে রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত এই নদীতীর যেন এক চলমান জীবনচিত্র।

কাশী সম্পর্কে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই নগরের পরিচয় শুধু তার মন্দিরে নয়, তার সরু গলিতে, প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রে, ঘাটে, কারুশিল্পে, সঙ্গীতে, সংস্কৃতচর্চায়, লোকজ ঐতিহ্যে এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এখানকার ইতিহাস কেবল রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস নয়; এটি নৌকার মাঝি, তাঁতি, শিল্পী, পণ্ডিত, সাধু-সন্ন্যাসী, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষেরও ইতিহাস। এই বহুমাত্রিক জীবনপ্রবাহই কাশীকে একটি 'প্রাণময় ঐতিহ্যের নগর'-এ পরিণত করেছে।

ভারতের ঐতিহ্যকে বুঝতে হলে কাশীকে শুধু দর্শন করলেই হয় না; তাকে পড়তে হয়, অনুভব করতে হয় এবং তার দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। কারণ কাশী আমাদের শেখায়— একটি সভ্যতার শক্তি কেবল তার প্রাচীনত্বে নয়, বরং পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েও তার মূল সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষমতায়। সেই কারণেই কাশী আজও ভারতের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। উনিশ শতকের অন্যতম সেরা কবি মির্জা গালিব বারাণসীর সৌন্দর্যে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর ফার্সি কবিতা গ্রন্থ 'চেরাগ-ই-দাইর' (মন্দিরের প্রদীপ)-এ শহরটিকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, 'বারাণসী হলো এক স্বর্গীয় আনন্দ, এটি পৃথিবীর বুকে স্থাপিত এক পরম স্বর্গ।'

এই প্রবন্ধে আমরা কাশীকে কোনো একক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, বরং ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন, নগরসভ্যতা, শিল্প-সংস্কৃতি এবং জীবন্ত ঐতিহ্যের সমন্বিত আলোকে দেখার চেষ্টা করব। কারণ কাশীর প্রকৃত পরিচয় তার বহুমাত্রিকতায় আর সেই বহুমাত্রিকতাই তাকে ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক জনপদে পরিণত করেছে। □



রামায়ণ আধুনিক অর্থে আইনের শাসন ধারণাটি তৈরি করেছে। ন্যায়বিচারের একটি সুস্পষ্ট আদর্শ সেখানে আছে। অপরাধী যত প্রিয় বা প্রভাবশালীই হোক, শাস্তি তার প্রাপ্য।

রামায়ণ, প্রশাসন ও সুশাসন

প্রাণকৃষ্ণ সরকার

রামায়ণ বললেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে শ্রীরামবনবাস, সীতাহরণ আর শ্রীরাম ও রাবণের যুদ্ধ। ধর্মগ্রন্থ হিসেবে, ইতিহাস হিসেবে কিংবা পালাগান হিসেবে এই কাহিনি ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের মনে গভীরভাবে গেঁথে আছে। কিন্তু একটু মন দিয়ে পড়লে দেখা যায়, এই মহাকাব্যের ভেতরে ছড়িয়ে আছে প্রশাসন পরিচালনার নানা ভাবনা। একজন শাসকের কী দায়িত্ব, মন্ত্রী কেমন হওয়া উচিত, রাজস্ব কীভাবে নেওয়া হবে, বিচার কেমন হবে, শত্রুর সঙ্গে কেমন আচরণ চলবে, এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে রামায়ণে অনেক সূত্র পাওয়া যায়।

রামায়ণ একটি কাব্যও বটে। কাব্যে আদর্শ আর বাস্তব প্রায়ই মিলেমিশে থাকে। তাই এখানকার রাষ্ট্রচিন্তাকে আধুনিক সংবিধানের মতো করে না দেখে বরং এটিকে সেই সময়ের মানুষ কেমন শাসক চাইত, তার একটি ছবি হিসেবে দেখা যেতে পারে।

রামায়ণের কেন্দ্রে আছে ধর্মের ধারণা। এখানে ধর্ম মানে শুধু পূজাপাঠ নয়, বরং কর্তব্য, নীতি আর ন্যায়ের সমষ্টি। রাজা এই ধর্মের ঊর্ধ্বে নন, তিনিও এর অধীন। রাজা সর্বশক্তিমান হতে পারেন, কিন্তু যা খুশি করার অধিকার তাঁর নেই। মহারাজা দশরথের কথাই ধরা যাক। কৈকেয়ীকে দেওয়া কথা রাখতে গিয়ে তিনি প্রিয়তম পুত্রকে বনে পাঠাতে বাধ্য হলেন। সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল কি না, সে তর্ক আলাদা। কিন্তু ঘটনাটা দেখায়, প্রতিশ্রুতির মূল্য সেখানে রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছার চেয়ে বেশি।

শ্রীরামের চরিত্রে এই ভাবনা সুস্পষ্ট। তিনি সিংহাসনে বসার ঠিক আগের মুহূর্তে বনবাস জীবন স্বীকার করলেন। কিন্তু অযোধ্যার মানুষ তাঁকেই রাজা হিসেবে চাইছিল। পরে মা সীতাকে ত্যাগ করার ঘটনাটিও এই আলোচনায় আসে। উত্তরকাণ্ডের এই অংশ নিয়ে আজও গভীর মতভেদ আছে। অনেকে একে দেশের প্রতি রাজার চূড়ান্ত আত্মত্যাগ বলে দেখেন। আবার অনেকে, বিশেষ করে নারীবাদীরা একে একজন নিরপরাধ নারীর প্রতি চরম অবিচার মনে করেন। দুই দৃষ্টিভঙ্গিই গুরুত্বপূর্ণ। তবে রাজনৈতিক অর্থে এটুকু বলা যায় যে, রামায়ণ ধরে নিয়েছে, জনগণের আস্থা ছাড়া রাজার আসন টেকে না। রাজাকে তাই সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে হয়। সেজন্য ব্যক্তিগত মূল্য দিতে হলেও।

আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়। রামায়ণে রাজাকে প্রজার পিতার মতো দেখা হয়েছে। শাসন করা তাঁর কাজ। কিন্তু তার আগে লালন করা আর রক্ষা করা। যে রাজার রাজ্যে প্রজা ভয়ে বা ক্ষোভে দিন কাটায়, তাঁর শাসন যত শক্তিশালীই

দেখাক, ভেতরে সেটা ফাঁপা ও শক্তিহীন।

অযোধ্যাকাণ্ডে ভরত চিত্রকূটে শ্রীরামের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেই সময় শ্রীরাম তাঁকে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলো প্রায় সবই 'কশ্চিৎ— মানে তুমি কি...?' শব্দ দিয়ে সব প্রশ্ন শুরু। এই অংশটি তাই সাধারণত 'কশ্চিৎ সর্গ' নামেও পরিচিত। দেখতে এটি কুশল জিজ্ঞাসার মতো। কিন্তু আসলে একটি দীর্ঘ প্রশাসনিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। শ্রীরাম জানতে চাইছেন— ভরত রাজ্য চালানোর কাজটা ঠিকভাবে বুঝেছেন কি না? মন্ত্রীদের বিষয়ে শ্রীরামের প্রশ্ন ছিল— যাঁদের তিনি মন্ত্রী করেছেন, তাঁরা কি যোগ্য, সৎ আর বিশ্বস্ত? তাঁরা কি গোপন কথা গোপন রাখতে জানেন? সঙ্গে একটি মূল্যবান পরামর্শও দেন। হাজার মূর্খের চেয়ে একজন পণ্ডিত ভালো। কারণ সংকটের সময় একজন বিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত মানুষই পথ দেখাতে পারে। আজকের ভাষায় বললে, সংখ্যা নয়, মান গুরুত্বপূর্ণ।

পরামর্শ আর গোপনীয়তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ভারসাম্যের কথাও আছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত পাকা হওয়ার আগে তা ফাঁস হওয়া চলবে না। একবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে বিলম্ব না করে তা কার্যকর করতে হবে। এই নীতি সব যুগের সরকারের জন্যই প্রযোজ্য। আলোচনা ছাড়া সিদ্ধান্ত খুব বিপজ্জনক। আবার আলোচনায় আটকে থাকাও ক্ষতিকর।

কর্মকর্তা বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও রামায়ণ আনুগত্যকে একমাত্র মাপকাঠি ধরেনি। যে কাজের জন্য যে উপযুক্ত, তাকে সেই কাজই দিতে হবে। ছোটো কাজে বড়ো বা গুণী লোক বা বড়ো কাজে অযোগ্য লোক বসালে ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

প্রশাসন চালাতে হলে অর্থ দরকার। আর সেই অর্থ আসে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে। রামায়ণের এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। ভাবার বিষয় হলো কতটা নেওয়া হবে? কেন নেওয়া হবে? আর কীভাবে? এখানে মূল কথা হলো সংযম। প্রজার ওপর অতিরিক্ত রাজস্ব চাপালে রাজ্যের ভিত নড়ে যায়। রাজস্ব এমন হওয়া উচিত যাতে রাজকোষ ভরে, কিন্তু কোনো ভাবে মানুষ নিঃস্ব না হয়।

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যকে রামায়ণে রাজ্যের অর্থাগমের মেরুদণ্ড হিসেবে দেখা হয়েছে। 'কশ্চিৎ সর্গে' রাম জানতে চান, কৃষক আর গোপালকেরা সুরক্ষিত আছে কি না? বাণিজ্যপথ নিরাপদ কি না? এখানে সুরক্ষার মানে শুধু ডাকাতের হাত থেকে বাঁচানো নয়। কর্মকর্তাদের অত্যাচার আর লোভ থেকেও উৎপাদনকারীদের রক্ষা করতে হবে। যারা সম্পদ তৈরি করে, তাদের নিরাপদ না রাখলে রাজ্যের সমৃদ্ধি টেকে না।

রামায়ণের কাহিনি কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সেখানে যুদ্ধ আছে। ষড়যন্ত্র আছে। শত্রুতা আছে। তাই নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনাও এখানে বেশ ব্যবহারিক।

১. গুপ্তচর : প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় গুপ্তচর হলো রাজার চোখ। রামায়ণেও সে ধারণা দেখা যায়। নিজের রাজ্যের ভেতরের খবর, শত্রুর গতিবিধি, আর এমনকী মিত্রের মনোভাব, সবকিছু জানার জন্য নজরদারির ব্যবস্থা থাকা দরকার। রাবণ সম্পর্কে এই ধারণা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। লঙ্কার চর শ্রীরামের শিবিরে ঢুকে পড়েছিল। আবার হনুমান, অঙ্গদ লঙ্কায় ঢুকে সব দেখে এসেছিলেন।

২. সেনাবাহিনী : শ্রীরাম ভরতকে মনে করিয়ে দেন, সৈনিকদের বেতন আর ভাতা যেন ঠিক সময়ে দেওয়া হয়। দেরি হলে তারা অসন্তুষ্ট হয়। আর অসন্তুষ্ট সেনা রাজ্যের জন্য সবচেয়ে বড়ো ঝুঁকিগুলোর একটি। আজও অনেক দেশের ইতিহাসে এর প্রমাণ মেলে।

৩. মিত্রতা : শ্রীরামের পুরো সামরিক অভিযান দাঁড়িয়ে ছিল মিত্রদের ওপর। কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের সঙ্গে চুক্তি হলো পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে। রাম সুগ্রীবকে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করলেন, বিনিময়ে সুগ্রীব সীতার খোঁজে বানর সেনা দিলেন। পরে লঙ্কায় রাবণের ভাই বিভীষণ রামের পক্ষে এলেন। শ্রীরাম তাঁকে আশ্রয় দিলেন, যদিও তাঁর শিবিরের অনেকে বিভীষণকে সন্দেহ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তটা শুধু উদারতা ছিল না, ছিল কৌশলও। শত্রুর ঘর থেকে একজন জ্ঞানী মানুষ নিজের দিকে আসা মানে শত্রুর ভেতরের দুর্বলতা জানা।

কূটনীতির প্রশ্নে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। —এই চার উপায়ের কথা প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিতে বহুবার এসেছে। রামায়ণেও এর ছায়া দেখা যায়। শ্রীরাম যুদ্ধের আগে অঙ্গদকে দূত করে রাবণের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তার মানে তিনি আলোচনার পথ বন্ধ করেননি। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হলে শক্তি প্রয়োগে দ্বিধা করেননি।

রামায়ণ আধুনিক অর্থে আইনের শাসন ধারণাটি তৈরি করেছে। ন্যায়বিচারের একটি সুস্পষ্ট আদর্শ সেখানে আছে। অপরাধী যত প্রিয় বা প্রভাবশালীই হোক, শাস্তি তার প্রাপ্য। বিচারে ঘুষ নেওয়া বা পক্ষপাত করা রাজ্যের জন্য ভয়ঙ্কর।

কশ্চিৎ সর্গের প্রশ্ন মনে রাখার মতো। শ্রীরাম জানতে চান, নির্দোষ কেউ মিথ্যা অভিযোগে শাস্তি পাচ্ছে না তো? আর দোষী কেউ টাকার জোরে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে না তো? এই উদ্বেগ আজকের যেকোনো বিচারব্যবস্থার জন্যই প্রাসঙ্গিক। বিচার নিরপেক্ষ হওয়া মানে শুধু শাস্তি দেওয়া নয়, প্রমাণ যাচাই করা। আর সেই সঙ্গে সঠিক অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া। শ্রীরাম ও রাবণ আসলে দুই ধরনের দুই শ্রেণীর শাসক।

রামায়ণের রাজনৈতিক বার্তা সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় শ্রীরাম ও রাবণের তুলনার মধ্যে দিয়ে। □

পণ্ডিত দীনদয়ালজীর রাজনৈতিক দর্শন

ডঃ বাপ্পাদিত্য মাইতি

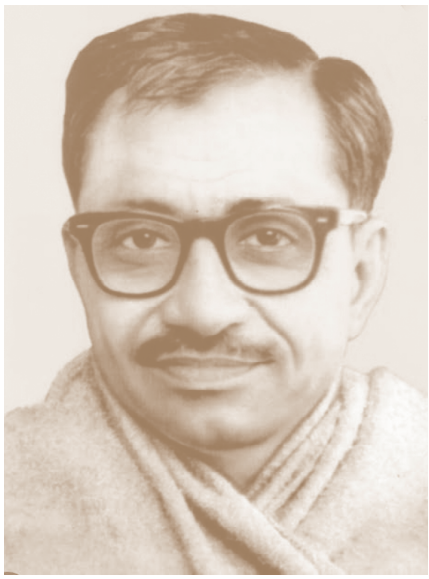

ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে চিন্তা ও বিশ্বাসের জগতে ব্যতিক্রমী মানুষেরা হন পথপ্রদর্শক। রাজনৈতিক দর্শনে যাঁরা প্রথার প্রচলিত পথে না হেঁটে নতুন কোনো গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব আনেন, মানব মুক্তির আলাদা পথ নির্মাণ করেন, তাঁরা স্বভাবত সাধারণের ভিড় থেকে থাকেন অনেক দূরে। রাতের নিঃসীম চাঁদ ডোবা অন্ধকারে নক্ষত্রের স্থির দীপ্ত আলোর মতো রাজনৈতিক তারকা হয়ে সৃষ্টিশীল আলো ছড়াতে থাকেন। পণ্ডিত দীনদয়ালজী এমন এক রাজনৈতিক নক্ষত্র যিনি পথ হারানো ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন ভাবনার বীজ রোপণ করেছিলেন।

রাজনীতিতে ক্ষমতাপ্রাপ্তি হলো বেশিরভাগের কাছে পরম কাম্য বস্তু। বস্তুত বিপুল অর্থ ও ক্ষমতা ভোগের এমন পার্থিব স্বর্গকে উপেক্ষা করা বেশিরভাগের পক্ষে সম্ভব হয় না। হিংস্রতা এবং আদর্শ বিচ্যুতি প্রায় হাত ধরে হাঁটে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সমাজ মন্থন করে বুঝেছিলেন ক্ষমতার এই বিষবাষ্প। আগে মানুষকে মানবিক হতে হবে তারপর আসবে রাজনীতি। কমিউনিস্টরা পৃথিবীর সব কিছুকেই অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করে ভাবেন আসলে মানুষ হলো অর্থনৈতিক জীব মাত্র। দীনদয়ালজী প্রথমেই এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আগে মানুষকেই যথার্থ অমৃতের পুত্র হতে হবে। নিছক অর্থনৈতিক নিকৃষ্ট জীব নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর বহু বিখ্যাত ও আলোচিত একাত্ম মানবদর্শনের কথা উঠে আসে।

ভারতীয় ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কার সম্পর্কে পণ্ডিতজীর ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা। মার্ক্সীয় দর্শনের মতো কখনোই বলেননি 'Money is the true currency of separation as well as the real means of mixing together.' বস্তুত মার্ক্সের এই উক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন পণ্ডিতজী। তাঁর চিন্তাধারা 'একাত্ম মানবদর্শন' সাম্যবাদী ভাবনার একেবারে বিপরীত পথ ধরে হাঁটে। তিনি মনে করেন নিছক অর্থনৈতিক বিষয় নয় বরং দেহ, মন, বুদ্ধি, আত্মা বা চৈতন্যের সাহায্যে মানুষের পূর্ণ সত্তাকে জাগ্রত করতে হবে। সেই জাগ্রত মানুষ ব্যক্তি ও সমাজের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির বিরোধ থেকে বেরিয়ে এসে দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধের সঙ্গে হাত ধরে হাঁটবে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সাম্য এনে যে শ্রেণীহীন বৈষম্যহীন ইউটোপিয়ান সমাজের ভাবনা কার্ল মার্ক্স ভেবেছিলেন তা বাস্তবে বিশ্বের কোনো দেশে, কখনোই ফলবতী হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়ায়, চীনে, কিউবাতে ধনীরা ক্রমান্বয়ে ধনী হয়েছেন। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডকেই মার্ক্স প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আর পণ্ডিতজী সনাতন ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছিলেন এদেশের গরীব মানুষের মধ্যে প্রাণের জাগরণ ঘটাতে পারলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এই জাগরণ ঘটবে লোকজ ভাবনা, তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, ধর্মবোধ এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবনা দ্বারা। পাশ্চাত্যধর্মী সাম্যবাদের সঙ্গে আর পণ্ডিতজীর চিন্তাপ্রসূত একাত্ম মানবদর্শনের একটি মৌলিক প্রভেদ রয়েছে। সাম্যবাদে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নামে পার্টির (অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের) ক্ষমতাকে চূড়ান্ত করা হয়েছিল। এহেন ব্যবস্থায় ব্যক্তির মতদানের কোন সুযোগই নেই। অন্যদিকে দীনদয়ালজী মনে করেন প্রত্যেক ভারতীয়র ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করা উচিত। নাগরিকদের স্বচ্ছ মতদানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের বিকাশ সম্ভব। তবেই যথার্থ ধর্মরাজ্য তৈরি হতে পারে। ধর্মরাজ্য বলতে ন্যায়, নীতিবোধ, সনাতন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে বোঝানো হয়েছে। আবার কমিউনিস্টদের সঙ্গে এখানেই বিপুল পার্থক্য। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত থাকলেই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর এক ধারণা জন্মায় এবং তা সমাজ নির্মাণে সহায়ক হয়। মার্ক্সবাদীদের মতো 'পুঁজিবাদ মুর্দাবাদ' বলে অর্থনীতির অগ্রগতিকে রুদ্ধ করা কখনোই বুদ্ধির কাজ নয়। তিনি মনে করতেন দেশের আর্থিক বৃদ্ধিকে গতিশীল করতে হলে শিল্প সাম্রাজ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং তা থেকে যে বিপুল মুনাফা আসবে তার একটি বড় অংশ দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় করতে হবে। সম্প্রতি ব্রাজিলের লুলা দা সিলভা সেই দেশের 'প্রেসিডেন্ট' পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। লুলা প্রথাগত বামপন্থার পথে হাঁটেননি। লুলা পুঁজিবাদের বিরোধিতা না করে তাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং মুনাফার একটি অংশ দিয়ে বোলসা ফামিলিয়া (Bolsa Familia) অর্থাৎ দরিদ্রতম মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এদেশীয় গো-খাদক কমিউনিস্টদের একটি অংশের মতো মিনারেল ওয়াটার, স্যান্ডউইচ খেয়ে গরিবের জন্য লিটার লিটার চোখের জল ফেলার মিথ্যা অভিনয় তিনি করেননি। বেলুড় মঠ ভেঙ্গে কফি হাউস বানাতে চাওয়ার ভয়াবহ মেকি বিপ্লবী পন্থা থেকে অনেক দূরে আছেন লুলা। তিনি সেদেশের সামাজিক ও উপাসনাপদ্ধতিগত ঐতিহ্য ও সংস্কারের বিরোধিতা করেননি। ব্রাজিলের মানুষ তাঁদের উপাসনাপদ্ধতি ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। সেদেশের সরকার বা প্রশাসনও সে পথে হাঁটেনি। লুলা এক শ্রেণী-সমন্বয় (Class Conciliation) করেছেন। ব্রাজিলের মানুষ তাঁদের পরম্পরা, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন না।

লুলা দা সিলভা যে সমস্ত কর্মকাণ্ড করছেন তাকে 'পপুলিস্ট রাজনীতি' বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম উল্লেখ করলেও ভারতীয় রাজনৈতিক দার্শনিক দীনদয়ালজীর প্রদর্শিত পথ থেকে তা কি বহু দূরে?

পণ্ডিত দীনদয়ালজী যে অসাধারণ যুক্তিবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা পৃথিবীর দূরতম দেশের রাষ্ট্রনায়ককেও প্রভাবিত করছে। যদিও বঙ্গীয় মেকি বিপ্লবীকুল পণ্ডিত দীনদয়ালজীকে

উপেক্ষা করে নিজেরাই অ্যামাজনের রেইন ফরেস্টে আশ্রয় নিয়ে চোখের জলে ভিজছে।

পণ্ডিতজী 'সনাতন' বলতে মানুষের অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন যা 'রাম রাজ্য' বা নীতিরাজ্য গড়তে সহায়ক হবে।

পণ্ডিতজী জানেন রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার দূর করতে হলে রাজনীতিতে সৎ আদর্শবান মানুষদের নিয়ে আসতে হবে। 'উপভোগশূন্য অধিপতি' যখন রাজনীতিতে আসবেন তখন তা হবে দেশের পক্ষে কালজয়ী সিদ্ধান্ত। তিনি দেখেছেন এদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর নানা দিক। শাসন ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িক উপাদানগুলি বড্ড ক্রিয়াশীল থাকে। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা নিজেদের স্বার্থে এই অমোঘ ব্যাধিকে পালন করে আসেন। ফলে ঐক্যবদ্ধ ভারতের পরিবর্তে আমরা গোষ্ঠী ও লোভের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দেখি। পণ্ডিতজী এই মনোভাবকে সরিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক শক্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ হলো— রাজনৈতিক দল শুধু ক্ষমতার কেন্দ্রে না থেকে আদর্শ ও সমর্পিত প্রাণ হয়ে দেশসেবায় যুক্ত হোক।

দীনদয়ালজী সব সময় মনে করেছেন 'রাষ্ট্র প্রথম' ও 'রাষ্ট্রহিত সর্বোপরি'। রাজনৈতিক দলগুলোর মতপার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংকটের সময় আমাদের একাত্ম হতে হবে। যে কংগ্রেস সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের বারবার কারাগারের অন্ধকার দেখিয়েছে সেই কংগ্রেস সরকারকেই ১৯৬২ সালের চীন যুদ্ধের সময় এবং ১৯৬৫ ও ১৯৭১-এ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বিপুল সমর্থন দিয়েছে। দীনদয়ালজী বিশ্বাস করেন রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে— দেশ, জাতি, সমাজ, মানুষ, ঐতিহ্য, সংস্কার, পরম্পরার সৃষ্টিশীল দিক। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে অটলবিহারী বাজপেয়ী হয়ে আজকের নরেন্দ্র মোদীর মতো রাজনৈতিক নেতৃত্ব— 'রাষ্ট্র প্রথম' নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে দীনদয়ালজীর দর্শন ভাবনাকেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' সৃষ্টির প্রথম থেকেই একাত্ম রাষ্ট্রবাদ (জাতীয় সংহতি), সামাজিক ন্যায়, গণতন্ত্র এবং স্বদেশি ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। দীনদয়ালজী মনে করতেন 'স্বদেশি ও বিকেন্দ্রীকরণ'-এর সাহায্যে অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করতে হবে। ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া ধারণা থেকে আমরা 'স্বদেশি' বলতে এখন আবার 'আধুনিকতা-বর্জিত' একটি ব্যাপার বুঝি।

অনেকে ভাবেন যে, স্বদেশি ভাবনা হলো পিছিয়ে পড়া একটি ধারণা এবং যেকোনো বিদেশি বিষয়ের মধ্যে একটি ঝকঝকে, আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং রয়েছে। এই দাসসুলভ মনোভাব আসলে দেশের মানুষের স্বদেশি চিন্তাকে কলুষিত করে। পণ্ডিতজী সঠিকভাবে বুঝেছিলেন 'পঞ্চায়েতরাজ ও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ'-এর মধ্য দিয়ে স্বল্প আয়সম্পন্ন, সমাজের প্রান্তিক মানুষটির কাছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায়। স্বদেশি মনোভাব ভারতবাসীকে অনৈতিক ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করা থেকে দূরে রাখবে। এর ফলে সমাজ এবং সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে। পণ্ডিতজীর স্বদেশি ভাবনা অতি বৃহৎ দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে উঠে এসেছে। তিনি মনে করেন রাজনৈতিক দলগুলো যদি মানবতার পথ থেকে সরে যায়, তবে জনতাকেই নরসিংহের ভূমিকা নিতে হবে। রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতা ত্যাগ করে দেশ ও জাতির কাজে আত্মনিয়োগ করা দরকার। তিনি মনে করেন একমাত্র 'রাষ্ট্রীয় দর্শন' বা জাতীয়তাবোধই পারে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিভেদ সৃষ্টিকারী দলগুলো থেকে দেশকে রক্ষা করতে। স্বচ্ছ মতদান এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দীনদয়ালজী বলেন— 'মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ভোট দান গুরুত্বপূর্ণ। এটাই গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র।'

যে মানুষেরা ভোট দেবেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে? এক্ষেত্রেও পণ্ডিতজী কুয়াশা-ছিন্ন করা রোদের মতো অতি স্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি মতপ্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানবোধ পরস্পর হাত মিলিয়ে চলুক।। স্বামী বিবেকানন্দ যে আত্মদর্শন ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের কথা বলেছিলেন, দীনদয়ালজী তাকেই রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির অন্যতম আয়ুধ বলে মনে করেন। তিনি জাতির কাছে আবেদন করলেন— 'ওঠো! জাগো! কালের কষ্টিপাথরে নিজেদের নাম দৃঢ়ভাবে লিখে যাও।'

এ তো সন্ন্যাসী ও রাষ্ট্রভাবুক স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর সহসাথী। পণ্ডিতজী জাতির বিবেক বা আত্মাকে সংগঠিত করাকেই 'বিরাট' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন সুপ্রাচীন কাল থেকেই এদেশের মানুষেরা সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছেন বলেই এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও সনাতন চেতনা বোধ রয়েছে। চৈতন্য যেমন ব্যক্তি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পৃথিবীতে নিয়ে যায় তেমনি এই জাগ্রত 'বিরাট' ভারতীয় জাতিকে দীর্ঘ পরাধীনতা, হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত করে শক্তিমান ও মর্যাদাদীপ্ত এক জাতিতে পরিণত করবে। সমস্ত হীনম্মন্যতা, অস্পৃশ্যতা, শ্রেণীগত বিভেদ দূর করে ভারত-আত্মাকে বুকে নিয়ে 'চিরকালের ভালো'র যাত্রী হতে বলেছিলেন পণ্ডিতজী। মনে পড়ে যায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের কথা— 'সকল দ্বন্দ্ববিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো / সেই তো তোমার ভালো।।'

পণ্ডিতজী বিশ্বাস করতেন আত্মশক্তির উদ্বোধনই ভারতকে করবে 'বিশ্বগুরু'। তিনি মনে করতেন উন্নত সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক চেতনা ও রাষ্ট্রবোধের দ্বারাই সনাতন জাতি ও সংস্কৃতি সামনের দিকে এগোবে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় দেশ, জাতি, সমাজ বিকাশের লক্ষ্যে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ— এই দু'টি পথ খোলা ছিল। দু'টি পথই পশ্চিমি ভাবনাযুক্ত। পাশ্চাত্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপাসনাপদ্ধতিগত পরিবেশের সঙ্গে এদেশের রয়েছে মূলগত পার্থক্য। ফলে পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনে যে অদ্ভুত, অভারতীয় বিচারধারা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সনাতনী সংস্কৃতি নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। পণ্ডিতজী মনে করেন নিজের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধ অনুকরণ জাতীয়তাবোধ ও সনাতন ঐতিহ্যকে দুর্বল করে দেশকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দাসে পরিণত করবে। একমাত্র ভারতীয় পরম্পরা মানুষকে একাত্ম বলে মনে করে। এই একাত্ম ভাব বা 'একাত্মতা' আত্মাকে বা ব্যক্তিসত্তাকে বিভক্ত করে না। সমাজ যেমন গ্রাম, জেলা, নগরের অধিবাসী, বনবাসী, জনজাতি ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠে, প্রত্যেক ব্যক্তিও সেরকম সমাজের প্রতিটি অংশ ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেশ গড়তে সাহায্য করবে।

আজ রাষ্ট্রবাদী আদর্শে পরিচালিত সরকার যখন দেশে ও বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন রাজনৈতিক কর্মীদের শুধুমাত্র দীনদয়ালজীর রচনাবলী পড়ে পণ্ডিত বক্তা হয়ে লাভ নেই। ব্যক্তিজীবনে 'একাত্ম মানবদর্শন' ও পণ্ডিতজীর অসাধারণ মূল্যবোধ সমন্বিত দর্শন ভাবনাকে আশ্রয় করে যদি এগোনো যায় তবেই তাঁর প্রতি সকলে একাত্ম হতে পারবে।

বিপুল বৈচিত্র্য ও বিভেদ থাকার জন্যে এদেশে সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ অত্যন্ত জরুরি। পণ্ডিতজী ছিলেন রাজনীতিতে ভারত-সংস্কৃতির দূত। যে রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তাধারা ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করেছিল, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে অকালে থামতে বাধ্য করেছিল— সেই ভাবনা বিপজ্জনক! পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মানবিক একাত্মবোধ রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত হিতকারী। □

হিন্দু ধর্মচিন্তন এবং একাত্ম মানবদর্শন

বিদ্রোহী কুমার সরকার

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শন বুঝতে হলে তাঁর বিশ্বদৃষ্টি তথা হিন্দু চিন্তনের অনুভব, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তন, সামাজিক বিচার, আর্থিক বিচার দর্শনকে জানা দরকার।

১৯৬৫-তে বিজয়ওয়াড়ার অধিবেশনে 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ'-এর সিদ্ধান্ত নীতির বিষয়ে তাঁর চারটি মূল্যবান ভাষণের প্রথম ভাষণ— 'একাত্ম মানবদর্শন'।

তিনি মনে করতেন স্বাধীনতার ১৬-১৭ বছর পার হওয়ার পরেও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো দিক্‌নির্দেশ আমরা দিতে পারছি না কেন ?

ইংরেজ চলে যাওয়ার পরেও রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, জীবন আদর্শ প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে বিদেশি বিচারধারা দূর করার তো দূরের কথা বরং আরও বেড়েই চলেছে। সমস্ত ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই বিদেশি চিন্তনকেই প্রমাণ্য ধরা হয়ে চলেছে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি, গীতার স্থানে স্মিথ-মার্ক্স-এঞ্জেলসের কথা স্থান নিচ্ছে।



তাদের বিচারধারা ভারতের প্রকৃতির সঙ্গে মেল খায় না। কাজেই এরকম বিচারধারা গ্রহণ করলে জাতীয় জীবনে বিপদ আসবেই। আমাদের দেশের সামনে যে সমস্যা তার মূল কারণ এটাই।

আজ এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ফেঁসে গেছে সারা বিশ্ব। এখন বিশ্বের প্রগতিতে আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি তার চিন্তন দরকার। ভারতীয় সংস্কৃতি পরম্পরা বিশ্বকে দেওয়ার যোগ্য অনেক কিছু আছে যাতে আমরা জগতের প্রগতিতে সহযোগিতা করতে পারি। বিগত হাজার বছর ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যস্ত থাকার কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হিসেবে আমরা দাঁড়াতে পারিনি। এখন তো আমরা স্বাধীন, এখনই তো সময় এই দুর্বলতা দূর করার ।

একাত্ম মানবদর্শনে এই কথাই বলা হয়েছে আছে যেখানে মনুষ্য জীবনকে শুধু আর্থিক দৃষ্টিতে না দেখে জীবনের সমস্ত দিক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষ এবং মনুষ্যেতর সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের একাত্ম সম্বন্ধ যা পরস্পর পরিপূরকতার কথা আছে। এতে সুদৃঢ়, সুখী ও কৃতার্থ জীবনের দিক নির্দেশ রয়েছে।

একাত্ম মানবদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির জীবনদর্শন। ভারতীয় সংস্কৃতি একাত্মতামূলক। এতে শরীর, মন, বুদ্ধি, আত্মা সংযুক্ত। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ; এই চার পুরুষার্থের সাধনা করার কথা রয়েছে।

এর সঙ্গে পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ এবং মানব সমাজের বিভিন্ন একাত্ম সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা রয়েছে। এই সবই রয়েছে মানুষের মধ্যে। তাই এই দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হলো মানবজাতি।

স্বাধীনতার আগে সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণে দেখা হতো। এখন দেখা হচ্ছে আর্থিক দৃষ্টিকোণে। কারণ আজ সাধ্য সাধনের বিবেক নষ্ট হয়ে গেছে। পয়সা রোজগারই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর চেয়ে যে বেশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত, সেই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। সাধ্য সাধনের বিবেকের বিবেচনা তিনি করেছেন।

তিনি আজকের অবস্থাকে তার বিকৃতি বলেছেন। দেশের আর্থিক বিকাশের জন্য পুঁজি দরকার, তাই প্রতিরক্ষাতে খরচ কমিয়ে তা সম্পূর্ণরূপে আর্থিক বিকাশে লাগাচ্ছি— এটা আত্মঘাতী ভাবনা। যদি প্রতিরক্ষার অভাবে আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলি, তবে আর্থিক বিকাশ করব কার? আবার কি পরাধীনতার শিকল আমাদের বেঁধে ফেলতে পারে না?

মানবজীবনের উদ্দেশ্য আর জীবনে সম্পদের স্থান সম্বন্ধীয় আমাদের পরিকল্পনাকে নিশ্চিত না করলে আর্থিক বিকাশ এবং আর্থিক বিকাশের জন্য আবশ্যক সাধনকে নিশ্চিত করা যাবে না। মানুষের বাহ্য আকৃতির জন্য তার মহত্ত্ব থাকে না। যেমন মন্দিরের মহত্ত্ব থাকে মন্দিরের ভেতরে স্থাপিত দেবতার বিগ্রহের কারণে। তার কারণে মন্দির মন্দিরত্ব প্রাপ্ত হয়। কাজেই সাধ্য সাধনকে নিশ্চিত করতে হবে বিবেকের সঙ্গে।

ভৌত আবশ্যকতা এবং জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মানুষের শারীরিক বিকাশ এবং তার জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজন আছেই। এই ন্যূনতম অর্থের অভাবই মানুষকে অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় ফেলে দেয়। আর্থিক অভাবের জন্য ব্যক্তির পক্ষে তার কর্তব্যরূপ ধর্ম পালনও কঠিন হয়ে ওঠে। জীবনের সুখ-সন্তোষ দুর্লভ হয়ে ওঠে। সে তখন অধিকতর সময় ও শক্তি তার পিছনেই খরচ করে।

অর্থের অভাব সমষ্টিগত হয়ে গেলে সমাজের সদগুণ ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। বলবানরা বলহীনদের শোষণ করে। দেশ অন্য সমস্ত দেশের কাছে সম্পূর্ণ অধীন হয়ে যায়। প্রথমে আসে আর্থিক দাসত্ব, শেষে রাজনৈতিক দাসত্ব। অর্থ, ধন, সম্পত্তি কেবল অভাব পূরণের জন্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তার প্রাচুর্যের জন্য ধর্ম হ্রাস পায়। এই প্রভাব কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বিচারই করা হয়নি। অর্থের প্রভাবকে দীনদয়ালজী স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন প্রত্যক্ষ সম্পত্তি ও তার সহায়তায় প্রাপ্ত বস্তু ও ভোগ বিলাসের উপকরণের উপর মানুষের আসক্তি জন্মায়। এটাই সম্পত্তির অধিকতর প্রভাবের লক্ষণ।ব্যক্তির সম্পত্তির লালসা তার দেশ, ধর্ম, মানবজীবনের পরম সুখ, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ভুলিয়ে দেয়। বিষয়াসক্ত মানুষ বিবেকহীন হয়ে ওঠে এবং সমাজের বিকাশ করার জন্য সমাজের বিনাশ করতে থাকে। তখন সম্পত্তি সাধনরূপে না থেকে একমাত্র সাধ্য হয়ে ওঠে। সম্পত্তি ধর্মাচরণের মাধ্যম না হয়ে বিষয়ভোগের উপকরণ হয়ে ওঠে। আর বিষয়ভোগের তো কোনো সীমা নেই। এটা বাড়তেই থাকে। শেষে এভাবে ব্যক্তি ও সমাজ নষ্ট হয়ে যায়। অত্যধিক আর্থিক প্রভাব সামাজিক মানসম্মান, অধিকার, পদ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা কেবল ধনবানরাই পায়। যদি সকলে ধনপরায়ণ হয়ে যায়, তখন ছোট-বড় যেকোনো কাজের জন্য অধিকতর অর্থের আবশ্যকতা দেখা দেয়। তখন সাধারণ লোকেদের জীবনে ধীরে ধীরে অর্থের অভাব নির্মিত হয়।

এই অর্থবিচারের বিরোধিতা দীনদয়ালজী করেছেন, অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রাণায়াম যেমন মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, সেরকম অর্থায়াম দেশের অর্থব্যবস্থার জন্য আবশ্যক। স্বাধীনতা মানব ও রাষ্ট্রের স্বাভাবিক চাহিদা। এই আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতন্ত্রতা সম্পন্ন গণতন্ত্র দরকার। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এরূপ গণতন্ত্র দরকার। জনগণ ও সমৃদ্ধদের স্বাভাবিক হিতের বাধক না হয়ে পোষক হয়ে উঠলে বুঝতে হবে সামাজিক স্বতন্ত্রতা এসেছে।

আর্থিক স্বাধীনতা না থাকলে সামাজিক স্বাধীনতা এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও পাওয়া যায় না। তাই এমন অর্থব্যবস্থা দরকার যা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংরক্ষণ দেবে।

দীনদয়ালজীর অধিকার সম্বন্ধীয় বিচার দেখলে বোঝা যায়, তিনি ভাবতেন রাজ্যের উৎপত্তি সামাজিক আবশ্যকতা পূরণের জন্য হয়েছে। সমাজ-সংসার একটি গুরুত্বপূর্ণ একক। ভারতে চুক্তিবদ্ধ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছে। মাৎস্যন্যায়ের স্থিতি থেকে রক্ষার জন্য রাজ্যের উৎপত্তি। অর্থাৎ মানবীয় বিকাশের জন্যই রাজ্য সৃষ্টি। প্রজার মধ্যে উৎপন্ন লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি ক্ষতিকর তত্ত্বের বিরুদ্ধে মানবীয় অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাজ্যের উৎপত্তি।

বিভিন্ন রকমের ক্ষুধা হয়। সুখের ক্ষুধা মানুষের থাকে। কিন্তু তার বিচার দরকার মন, শরীর, বুদ্ধি, আত্মার দৃষ্টিতে। তা না হলে মানুষ পশু হয়ে যাবে। তাই সামনে কিছু উচ্চ জীবনলক্ষ্য রাখতে হবে।

একাত্ম মানবদর্শনে বলা হয়েছে, ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ মানব সমাজ ও মানবেতর সমাজ উভয়কে একাত্ম দৃষ্টিতে দেখতে হবে। একাত্ম জীবনে ভৌতিক সুখের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক সুখের অনুভূতি লাভ করতে হবে। মানুষের ব্যক্তিগত স্তরের লক্ষ্য ব্যক্তির মমত্বভরা পরিধিকে অহম্ থেকে বয়ম্-এর দিকে বাড়াতে হবে। তবেই দৃষ্টি বিশ্বমানব পর্যন্ত যাবে। সেখান থেকে জড় চেতনময় সংসারে ব্যাপ্ত হবে। শেষে পরমেষ্ঠী পর্যন্ত সংসার পৌঁছাবে।

একাত্ম মানবদর্শনে সুখের কামনাকে একাঙ্গী মানা হয় না। সুখের বিচার সমগ্র দৃষ্টিতে করতে হবে। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন, বুদ্ধি, আত্মার উত্তরণ ঘটাতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে সংযম ও সমর্পণের ভাবনা রাখতে হবে। অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যবোধকে যুক্ত করতে হবে। ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টি, সৃষ্টি, পরমেষ্ঠীর নিরন্তর সাধনা করতে হবে। এভাবে চলতে পারলে একাত্ম সুখ অনুভূত হবে।

একাত্ম মানবদর্শনের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও সমষ্টি সম্পর্কিত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাকার করতে পারে। চতুর্বর্গের কাম স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক বাসনা পর্যন্তই সীমিত নয়। 'ন জাতু কামঃ কামানুপভোগেন শাম্যতি।' এতে সমস্ত ইন্দ্রিয় সমূহের সমাবেশ রয়েছে। 'নত্বহং কাম রাজ্যং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবম্।'বা 'কাময়ে দুঃখতাপ্তানাং প্রাণিনাম্ আর্তি নাশনম্।'—এর মতো বচনে কামের উচ্চতা ও ধন্যতা জাগানো যায়। আসলে মানুষের মনে উৎপন্ন হতে পারে এমন কাম, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যা অনন্তব্যাপী, তাই 'কাম' পুরুষার্থের মধ্যে পড়ে।

মানুষের মন চঞ্চল। পাখির মতো যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এরকম দিশাহীন মন যদি শ্রেষ্ঠতম জীবনের প্রতি একাত্ম হয়ে যায়, তবেই সে সেই লক্ষ্যের দিকে নিষ্ঠাপূর্বক অগ্রসর হতে পারে এবং তা লাভ করতে পারে। কাম পুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক বিভিন্ন উপাদান জোগানো হলো অর্থ পুরুষার্থের কাজ। কেবল শারীরিক সুখ নয়, বরং তার ধারণার জন্য যে অন্য বস্তু দরকার, তার প্রাপ্তি অর্থের ওপর নির্ভরশীল। কামের দ্বারা মানুষ নিজেকে অভিব্যক্ত করে। সে তার আত্মা এবং সমগ্র জীবনকে অভিব্যক্ত করে। কৃষক কৃষির সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে বিকশিত করে, সেটা তার জীবনের অঙ্গ হয়ে যায়। তাঁতির হাতের কৌশল, সেতার বাদকের আঙুলের ব্যবহার, নর্তকের পদবিন্যাস, অঙ্গভঙ্গীর যে তাল— সেটা তো তার জীবনকেই প্রকট করে।

অর্থ, ধর্ম ও সমাজ ভাবনা :

অর্থের অভাব : অর্থের অভাব ব্যক্তিধর্ম ও সমষ্টিধর্ম; উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। এতে মানুষ জীবধর্মের যথোচিত পালন করতে পারে না এবং অধর্মের পথে যেতে থাকে ।

কাম ও অর্থ : কাম পুরুষার্থের পিছনে অর্থ পুরুষার্থ চলতে থাকে। অর্থের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হলে সুশিক্ষা, সদাচার, সুসংস্কার

অর্থাৎ এককথায় ধর্মের শরণ নিতে হয়।

ধর্ম শব্দ : 'ধর্ম' শব্দ বহুমুখী এবং ব্যাপক আশ্রয়যুক্ত । এর দ্বারা পদার্থের গুণবিশেষ, প্রকৃতির নিয়ম, জীবনের আধ্যাত্মিক নিয়ম, কর্তব্য ইত্যাদি অনেক কিছু প্রকাশ পায়। কাঠিন্য, তরলতা, প্রবাহশীলতা, সুগন্ধ, শীতলতা প্রভৃতি পদার্থের গুণকে প্রাকৃতিক গুণ হিসেবে ধরা হয়েছে।

দায়িত্ব ও নির্দেশ : পিতৃধর্ম, মাতৃধর্ম প্রভৃতির দ্বারা সংযুক্ত ব্যক্তির দায়িত্বের পরিযায়ক রাজধর্ম, সমষ্টিধর্ম কর্তব্যের দিকে দিক নির্দেশ করে। ব্যষ্টিধর্ম সে সমস্ত নিয়মের কথা বলে যা ব্যক্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

পরিবার ও সমাজ : পরিবারের কল্পনাকে অনেক বড় করে তাকে সমাজব্যাপী করে আত্মিক বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় । এটাই একাত্ম মানবদর্শনের কেন্দ্রীয় কল্পনা। ব্যক্তি সমৃদ্ধ হয়ে নিজের হিতের জন্য, সম্বন্ধ রক্ষার জন্য সমাজ তৈরি করেছে।

সমাজ ও ব্যক্তি : পশ্চিমি ধারণায় ব্যক্তি সমাজ থেকে শ্রেষ্ঠ। বিপরীতে ভারতীয় ধারণায়, ব্যক্তির জন্যই সমাজ নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে যাচ্ছে। তাই সমাজ সব স্থিতিই ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ব্যক্তির গুপ্ত গুণের প্রকটীকরণ বা বিকাশ সমাজের জন্যই হয়।

কলা ও সংস্কৃতি : যেকোনো কলা পরিপক্ক হওয়া, তার জন্য অভিনন্দন পাওয়া সবই সমাজদান। যেকোনো প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শের দ্বারা সংক্ষরিত করে পরম্পরা তৈরি করে, সেই পরম্পরাকে নিজের জন্য প্রজন্মের হাতে সঁপে দেয়। এটাই সমাজ।

শ্রেষ্ঠ আদর্শের এই অখণ্ড পরম্পরা সমাজকে জীবন্ত ও একাত্ম রাখে, প্রগতি এনে দেয়।

পুরুষার্থ ও রাষ্ট্র : অর্থ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মতাদর্শ ব্যক্তির মতো সমাজকে (অর্থাৎ সমষ্টিকে) তার রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য। রাষ্ট্রের কাম পুরুষার্থ পূরণের জন্য অর্থ পুরুষার্থকে সাধকরূপে বিকাশ করতে হলে প্রতি সক্ষম ব্যক্তির হাতে কাজ দিতে হবে, যাতে সে নিজে নির্বাহ করতে পারে। এমন যোগ্য কাজ দিতে হবে যাতে ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে সাঙ্গে রাষ্ট্র বিকশিত হতে পারে।

রাষ্ট্রের আর্থিক সমৃদ্ধি হলে সমাজের সামূহিক কর্তব্যশক্তি বাড়ে। মানুষের সামনে এমন উচ্চ রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ব্যক্তি সব রকম পরিশ্রম করতে প্রস্তুত থাকে।

একাত্ম মানবদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির ভূ মিতে বিকশিত হয়েছে। এখানে শুধু মানবের বিচারই করা হয়নি, মনুষ্যেতর প্রাণী, বনস্পতি, সৃষ্টি, প্রকৃতির অন্য সমস্ত কিছুর ভাবনা নিহিত আছে ।

এটাই আজ উপযুক্ত ও অপরিহার্য। এর অভাবে কোনো সুখ উপভোগ সম্ভব নয়, প্রত্যক্ষ জীবন কঠিন হয়ে উঠবে।

এখানে ভূমিকে ভোগভূমি হিসেবে না দেখে ধর্মভূমি, কর্মভূমি, পুণ্যভূমিও বলা হয়েছে। নদী, গোরু সকলকে তার বাহ্য রূপ দিয়ে বিচার করা হয়নি। কেবল ভোগবাসনার সঙ্গে এগুলি না জড়িয়ে অগাধ ভক্তিভাবনা ও আত্মীয়তার সঙ্গে ওতপ্রোত হিসেবে দেখা হয়েছে। একাত্মতার সজীব অনুভূ তি ও বোধশক্তি পরিবার, রাষ্ট্রাভিমুখে ওঠার যে ক্রম, তাতে সমস্ত মানব সমাজকে সংহত করছে।

এর জন্যই এই ভারতবর্ষ অন্য দেশের সঙ্গে আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছে। কাজেই জীবন দর্শনের যে সঠিক পথ তাকে প্রত্যক্ষ জীবনে আনা আমাদের নিজেদের দায়িত্ব।

হিন্দুধর্ম বা বৈদিক ধর্মের স্বরূপ বৃহৎ ও ব্যাপক। এতে উদারতা, দয়া, করুণা, সার্বভৌম, সর্বগ্রাহী, অনাদি, সনাতন, চিরন্তন, সংবেদনশীলতা, প্রকৃতিমুখী, প্রকৃতিকে পুষ্ট করা, প্রকৃতি দ্বারা প্রষিত হওয়া সমস্ত কিছুই সমাবিষ্ট ।

বৈদিক দৃষ্টিতে ত্রিলোকের কথা রয়েছে— পৃথিবী, অতল, আকাশ। প্রত্যেক স্থানে পৃথক পৃথক দেবতাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। বহু দেবতাবাদী তত্ত্ব এসেছে, যজ্ঞ, পূজাপাট, উপাসনা, অনুষ্ঠান যুক্ত হয়েছে।

পূজিত অগ্নি, ইন্দ্র, পবন, সম পৃথিবী, সূর্য আদি সমস্ত দেবী-দেবতা কোনো না কোনো প্রাকৃতিক গুণকে ধারণ করেন। সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মানুষের দ্বারা সবার পূজার পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। পূজার অর্থই হলো সেইসব শক্তির সুরক্ষা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

সনাতন ধর্মের দশটি তত্ত্ব ও বিশ্বকল্যাণ ভাবনা :

(১) দশটি প্রধান লক্ষণ ও তত্ত্ব : ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ; এই দশটি হলো হিন্দু ধর্মের মূল ধর্ম লক্ষণ বা তত্ত্ব

সর্বকল্যাণরূপী হিন্দু ধর্মের এই দশটি তত্ত্ব পালনের মাধ্যমেই সমাজে সমরসতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) বিশ্বজনীন কল্যাণ ও বন্ধুভাবনা : এই কল্যাণ শুধুমাত্র হিন্দু সমাজের কল্যাণের সঙ্গেই যুক্ত নয়, বরং এটি সর্বলোকের সঙ্গে যুক্ত। সকলে ধর্মের আচরণ করুক, অধর্মের পথ থেকে দূরে থাকুক এবং জীবহিংসা থেকে মুক্ত থাকুক— এটাই কাম্য ।

সবার সমৃদ্ধি হোক, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি হোক, একে অপরের সহযোগী হোক এবং কাউকে দ্বেষ বা হিংসার আশ্রয় না দেওয়া হোক। সমস্ত ভাবনা সর্বকল্যাণের জন্য নিবেদিত ।

(৩) বসুধৈব কুটুম্বকম্ ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি : 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' (সারা বিশ্ব এক পরিবার)— এই বিচারটি হিন্দুধর্ম দিয়েছে, যা অন্য কোনো ধর্ম বা মত দিতে পারেনি। এর মাধ্যমেই হিন্দুত্বের বৈশ্বিক ধারণা এবং বিশ্বজুড়ে এক পরিবার গড়ে তোলার ভাব প্রকাশ পায়।

(৪) সমষ্টিচিন্তা ও চেতনাবোধ : এটি কোনো ক্ষুদ্র বা হীনের চিন্তা নয়, বরং এটি একটি সমষ্টিচিত্তা। এই চিন্তনই বিশ্ব মানবের জন্য কল্যাণপ্রদ ও লাভদায়ক।

প্রত্যেকেই এক চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এর মধ্যে কোনো ভেদভাব বা বিভেদ নেই।

দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ--- সবই এই পূর্ণচিত্তনের অঙ্গ এবং জড়-চেতন-এর অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই বলা যায় যে, ভারতীয় এই চিন্তন দর্শন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ংপরিপূর্ণ। □

দীনদয়াল

যেমন নাম তেমনই তাঁর আচরণ। তিনি তখন কানপুরে এমএ পড়ছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক নানাজী দেশমুখের সঙ্গে থাকতেন। একদিন তাঁরা দুজনেই



শাকসবজি কেনার জন্য বাজারে গেছেন। ফেরার সময় তিনি পকেটে হাত ঢুকিয়ে চমকে উঠে নানাজী দেশমুখকে বললেন, খুব ভুল হয়ে গেছে, আমি সবজিবিক্রেতা বুড়িমাকে দাম দেবার সময় অচল পয়সাটি দিয়ে ফেলেছি। তাঁরা দুজনেই তাড়াতাড়ি ওই বুড়িমার কাছে ফিরে গেলেন। দীনদয়ালজী বললেন, বুড়িমা, খুব ভুল হয়ে গেছে, তোমাকে অচল পয়সাটি দিয়ে ফেলেছি। ওটা দাও আর এই ভালো পয়সাটি নাও।

বুড়িমা বললেন, আমি চোখে খুব একটা ভালো দেখতে পাই না, আর এত পয়সার মধ্যে ওটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তুমি এখন যাও। দীনদয়ালজী বললেন, না না, তোমার থলেটা দাও, আমি খুঁজে নিচ্ছি। তারপর কানা পয়সাটি খুঁজে পেয়ে ভালো পয়সা বুড়িমার হাতে দিয়ে দিলেন। এসব দেখে বুড়িমা বললেন, বেটা, তুমি তো খুব ভালো মানুষ!

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ১৯১৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মথুরা জেলার নাগলা চন্দ্রভান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়িতে সবাই তাঁকে আদর করে দীনা বলে ডাকত। খুব ছেটোবেলায় বাবা-মা দুজনকে হারানোর কারণে তাঁর শৈশব খুব কষ্টে কাটে। দাদুর বাড়িতে তিনি বড়ো হন। সেখানেই তাঁর লেখাপড়া, শিক্ষাদীক্ষা হয়। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। দাদুর বদলির চাকরির কারণে গঙ্গাপুর, কোটা, রাজগড়, শিকার, পিলানি প্রভৃতি জায়গায় পড়াশোনা করতে হয়। রাজস্থানের শিকার হাইস্কুলে তিনি বোর্ড পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এজন্য শিকারের মহারাজা কল্যাণ সিংহ তাঁকে একটি স্বর্ণপদক, মাসিক দশ টাকা বৃত্তি এবং বই কেনার জন্য ২৫০ টাকা দিয়েছিলেন।

এরপর তিনি ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য পিলানিতে এসে বিড়লা কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বোর্ড পরীক্ষায় শুধু প্রথমই হননি, সমস্ত বিষয়ে ডিস্টিংশন অর্জন করেন। এজন্য ঘনশ্যাম দাস বিড়লার কাছ থেকে তিনি আবার স্বর্ণপদক, মাসিক ১০ টাকার বৃত্তি ও বই কেনার জন্য ২৫০ টাকা লাভ করেন। এরপর তিন কানপুর সনাতন ধর্ম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ করে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পড়ার জন্য আগ্রার সেন্ট জন'স কলেজে ভর্তি হন। এরপর বিটি করার জন্য প্রয়াগে চলে আসেন।

১৯৩৭ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। পড়াশোনা শেষ করে কিছুদিন সরকারি চাকরিও করেন। তারপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সঙ্ঘের প্রচারকের জীবন গ্রহণ করেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপন করলে তিনি তার সাধারণ সম্পাদক হন। পরে সভাপতি হন। সভাপতি হওয়ার মাত্র ৪৩ দিন পর, ১৯৬৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ৫১ বছর বয়সে বর্তমান প্রয়াগরাজ রেললাইনের পাশে রহস্যজনক অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

শুভম দাস

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ

মল্লিকার্জুন



দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের নন্দিয়াল জেলার শ্রীশৈলম পর্বতে অবস্থিত মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ। এই মন্দির একাধারে শিব (মল্লিকার্জুন) এবং শক্তি (ভ্রমরম্বা)-র মিলনস্থল। মন্দির চত্বর পূর্বমুখী এবং এখানে বহু স্তম্ভযুক্ত সুন্দর মণ্ডপ এবং নন্দীকেশ্বরের বিশাল মূর্তি রয়েছে। সাতবাহন রাজবংশের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে এখানে প্রথম মন্দির নির্মিত হয়েছিল। বর্তমান মন্দিরটি ১৮৩ মিটার উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাঙ্গণে বেশ কিছু ভাস্কর্য রয়েছে, যার প্রতিটি একটির উপরে আর একটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান মন্দিরটি সপ্তম শতাব্দীর বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, এখানে যে হাজারটি শিবলিঙ্গ আছে তা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং আরও যে পাঁচটি লিঙ্গম রয়েছে তা পাণ্ডবদের দ্বারা নির্মিত।

এসো সংস্কৃত শিখি-১৩০

দশদিবসেষু সংস্কৃতং বদতু

প্রথমদিবসঃ

কেচন শব্দাঃ

অত্র—এখানে। **তত্র**—সেখানে বা ওখানে। **কুত্র**—কোথায়?

অত্র পুস্তকম্ অস্তি—(কাছে) এখানে বইটি রয়েছে। তত্র ছাত্রঃ অস্তি— (দূরে) ওখানে ছাত্রটি রয়েছে। কুত্র ছাত্রঃ অস্তি?—কোথায় ছাত্রটি রয়েছে?

অস্তি—আছে। **নাস্তি**— নেই। মম হস্তে মার্জনী অস্তি—আমার হাতে ডাস্টার রয়েছে। অত্র মম জনকঃ নাস্তি— এখানে আমার বাবা নেই

(সংস্কৃতের পথে একটি পদক্ষেপ)

ভালো কথা

দুঃখজনক

এবার দুর্গাপূজায় আমাদের পাড়ায় একটি খুবই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় চোরবাগান দুর্গাপ্যান্ডেলে ঠাকুর দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেসময় জোরে বৃষ্টি আসায় সবাই হুড়োহুড়ি করে প্যান্ডেলের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। তাতে ভিড়ের চাপে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে ও আহত হয়েছে। পাড়ার মানুষ ও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছিল। এই ঘটনায় পরদিন থেকে আমাদের এলাকার পূজামণ্ডপে সন্ধ্যায় তিনঘণ্টার জন্য মাইক বাজানো বন্ধ ছিল। লোকেরা আর তেমন ঠাকুর দেখতে বের হয়নি। পুলিশ চোরবাগানের পূজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

সমরজিৎ দাস, সপ্তম শ্রেণী, মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কল-৭।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

মহালয়ার ভোরবেলা

কৌস্তভ চক্রবর্তী, ষষ্ঠ শ্রেণী, বর্ধমান সি এম এস উচ্চ বিদ্যালয়।

মহালয়ার দিন ভোরবেলা
সবার বাড়ির দোর খোলা।
সবাই উঠে রেডিয়োতে
মহালয়ার স্তোত্র শোনে।
ছোটোরা সব অনেক জানে
চলে যায় ছাদের কোণে।
গিয়ে তারা পটকা ফাটায়,
মহালয়ার সুখটা মেটায়।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের কণ্টকাকীর্ণ মার্গ পেরিয়ে অন্ত্যোদয়ের লক্ষ্যে ধাবমান একাত্ম মানবদর্শন

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'একাত্ম মানবদর্শন' এবং 'অন্ত্যোদয়' আজ আধুনিক ভারতের সমাজকল্যাণমূলক শাসনের মূল ভিত্তি— যা অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা এবং জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে।

ড. অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকুম্ভের জনসমুদ্রে প্রকৃত স্নান

প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে অর্ধকুম্ভের পুণ্যলগ্নে সমবেত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। শঙ্খধ্বনি, বৈদিক মন্ত্রোচারণ আর সাধুসন্ন্যাসীদের হরিনামে চারপাশ মুখরিত। মোক্ষলাভের আশায় ভারতের দূরদূরান্ত থেকে হেঁটে এসেছেন অগণিত সাধারণ মানুষ। কিন্তু সেই ভিড়ের মাঝে, যাবতীয় আড়ম্বর ও ভিআইপি সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করে ধুলোবালি মাখা সাধারণ খাদি কুর্তা-ধুতি পরে এক সেবামণ্ডপে নিঃশব্দে কাজ করে চলছিলেন এক সঙ্ঘপ্রচারক--- পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

শাহী স্নানের শুভ লগ্ন ঘনিয়ে এলে সেবামণ্ডপের এক তরুণ সংগঠক তাঁকে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'পণ্ডিতজী, চারদিক ধুলোয় ধূসরিত। দিনভর সাধারণ পুণ্যার্থীদের সেবা করতেই কেটে গেল, সঙ্গমে পুণ্যস্নানে যাবেন না?' দীনদয়ালজী মৃদু হেসে ক্লান্ত কপাল থেকে ধুলো মুছে উত্তর দিয়েছিলেন, 'সাধারণ মানুষের কাছে গঙ্গাজলে ডুব দেওয়াই স্নান। কিন্তু দূরদূরান্ত থেকে আসা এই নিঃস্ব, শোষিত মানুষের মধ্যেই আমার পরমেশ্বরের বাস।

সারির একদম শেষে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির মুখে অন্ন ও মাথার ওপর ছাদ তুলে দেওয়াই আমার প্রকৃত পূজা। মানবসেবার এই সাধনাই আমার আসল কুম্ভস্নান— আমার জীবনের অন্ত্যোদয়।'

একাত্ম মানবদর্শন : মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে দেশজ বিকল্প

১৯৬৫ সালের এপ্রিলে বোম্বাইয়ের জ্ঞানমণ্ডল বক্তৃতামালায় দীনদয়াল উপাধ্যায় চারটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যা পরবর্তীতে 'একাত্ম মানবদর্শন' নামে ভারতীয় জনসঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়। পশ্চিমা পুঁজিবাদ ও মার্ক্সীয় সমাজবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এটি ছিল এক শক্তিশালী ভারতীয় বৈচারিক সংকল্পপত্র।

মার্ক্সবাদী শ্রেণীসংগ্রাম ও বস্তুবাদ মানুষকে নিছক এক 'অর্থনৈতিক জীব' বা কারখানার কলকব্জায় পরিণত করেছিল। দীনদয়ালজী যুক্তি দেন, মানুষ কেবল বস্তুগত চাহিদা মেটানোর যন্ত্র নয়; সে দেহ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার এক অখণ্ড সমষ্টি। ভারতীয় সভ্যতার চতুর্বর্গ— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ সম্ভব।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী রামাশ্রয় রায় তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদ যেমন কিছু ধনকুবেরের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে, তেমনই সাম্যবাদ সর্বগ্রাসী সরকারিতন্ত্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা সঁপে দেয়। এর ফলে সাম্যবাদে ব্যক্তি হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীনতা। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞানী ক্রিস্টোফ জাফ্রেলা এবং চেতন ভাট তুলে ধরেন যে, সমাজকে শ্রেণীসংগ্রামের চিরন্তন যুদ্ধক্ষেত্র না ভেবে দীনদয়ালজী সমাজকে এক জীবন্ত সত্তা বা অঙ্গ হিসেবে দেখেছিলেন, যার নিজস্ব সচেতনতা রয়েছে— যাকে তিনি অভিহিত করেছিলেন 'চিতি' এবং যার শক্তি হলো 'প্রাণ'।

বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

স্বাধীনোত্তর ভারতে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা সংবাদপত্র, সাহিত্য পত্রিকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একক আধিপত্য গড়ে তুলেছিলেন। সিপিআইয়ের প্রকাশনা থেকে থেকে প্রকাশিত পুস্তিকায় এবং সেমিনার ও ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইউকলির (ইপিডাব্লিউ) মতো পত্রিকায় একাত্ম মানবদর্শন ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' ও 'উগ্র মতাদর্শ' হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলে।

এই সুসংগঠিত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দীনদয়াল উপাধ্যায় নিজস্ব বিকল্প সংবাদমাধ্যম গড়ে তোলেন। লখনউ থেকে প্রকাশিত 'রাষ্ট্রধর্ম' মাসিক, 'পাঞ্চজন্য' সাপ্তাহিক এবং 'স্বদেশ' দৈনিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হিসেবে তিনি লেখনী ধরেন। উইকলি অর্গানাইজারে প্রকাশিত তাঁর নিয়মমাফিক রাজনৈতিক কলাম ছিল তৎকালীন বামপন্থী প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে ধারালো বুদ্ধিবৃত্তিক অস্ত্র। বিশেষত ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের সময় সিপিআইয়ের রাষ্ট্রবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে তিনি স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রেও ইতিহাসবিদ অরুণ শৌরির গবেষণায় দেখা যায়, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস ও প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স

অ্যাসোসিয়েশন কীভাবে জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদদের পাঠ্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে নানাজী দেশমুখের প্রতিষ্ঠিত দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং 'মন্থন' পত্রিকার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে এই দর্শনের পুনর্বাসন শুরু হয়।

কেরালা থেকে নকশালবাড়ি : হিংসার রাজনৈতিক বিস্তার

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ওপর বামপন্থীদের ক্ষোভ কেবল নীতিগত তর্কে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা নেমে এসেছিল রক্তাক্ত সংঘাতের ময়দানে। কেরালায় ১৯৪০-এর দশক থেকেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ওপর শারীরিক আক্রমণ শুরু হয়। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে ক্যালিকটে জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় অধিবেশনে দীনদয়ালজী সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সাফল্য বাম দুর্গকে কাঁপিয়ে দেয়। এর পরেই ১৯৬৯ সালে থ্যালাসেরিতে ভাদিক্কাল রামকৃষ্ণন নামে এক তরুণ শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়, যা কেরালায় বাম-সঙ্ঘ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে।

অন্যদিকে ১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে চারু মজুমদার ও কানু সান্যালের নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়। চারু মজুমদারের 'খতম লাইন' বা রাজনৈতিক শত্রু খতমের নীতিতে জনসঙ্ঘ ও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের 'শ্রেণী শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করে হত্যা করার আহ্বান জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশে বহু স্বয়ংসেবক এই হিংসার শিকার হন।

মুঘলসরাইয়ের অভিশপ্ত রাত্রি ও রহস্যের জালে মৃত্যু

১৯৬৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি, সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র দু' মাসের মাথায় মুঘলসরাই (বর্তমানে প্রয়াগরাজ) স্টেশনের কাছে পাওয়া যায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের রক্তাক্ত দেহ। ১০ ফেব্রুয়ারি রাতে লখনৌই থেকে শিয়ালদহ এক্সপ্রেসে পাটনা যাওয়ার পথে জৌনপুরের পর তাঁকে আর জীবিত দেখা যায়নি। রাত দুটো কুড়ি মিনিটে মুঘলসরাই স্টেশনের ৭৪৮ ফুট দূরে

"আজ ইতিহাস তাঁর চূড়ান্ত রায় দিয়ে দিয়েছে। যে বামপন্থী মতাদর্শ হিংসা ও শ্রেণীসংগ্রামের ওপর ভর করে আধিপত্য চালাতে চেয়েছিল, তা আজ রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিলুপ্তির পথে।"

১২৭৬ নম্বর ইলেকট্রিক পোলের কাছে তাঁর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর ডানহাতে শক্ত করে ধরা ছিল একটি পাঁচ টাকার নোট, পোশাক ও ঘড়ি অক্ষত থাকলেও পকেটের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাগজপত্র উধাও হয়ে গিয়েছিল।

সিবিআই তদন্ত শেষে দুই মামুলি চোরকে দোষী সাব্যস্ত করে দাবি করে যে, চুরি করার সময় ধরা পড়ে যাওয়ায় তারা দীনদয়ালজীকে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু বারাণসী সেশন কোর্ট এই মনগড়া গল্প পুরোপুরি খারিজ করে আসামিদের বেকসুর খালাস করে দেয় এবং স্পষ্ট জানায় যে হত্যাকাণ্ডের আসল সত্য উন্মোচিত হয়নি।

পরবর্তীতে দেশজুড়ে দাবির মুখে গঠিত বিচারপতি ওয়াই ভি চন্দ্রচূড় তদন্ত কমিশন রিপোর্টে জানান যে, পুলিশ রেকর্ড থেকে এফআইআর ও কেস ডায়েরি রহস্যজনক ভাবে গায়েব হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর সহযাত্রী মেজর এস এল শর্মার ভূমিকা ছিল চরম সন্দেহজনক। জনসঙ্ঘের বর্ষীয়ান নেতা বলরাজ মাধোক তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্ট অভিযোগ করেন, উদীয়মান বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিকে স্তব্ধ করতেই তৎকালীন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল।

অপপ্রচার অতিক্রম করে 'অন্ত্যোদয়' -এর উজ্জ্বল জয়যাত্রা

মৃত্যুর পর বামপন্থী পোর্টাল ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে 'উচ্চবর্ণের স্বার্থরক্ষাকারী' বলে অপপ্রচার চালালেও, প্রখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুদেশ বর্মার গবেষণায় উঠে আসে কীভাবে দীনদয়ালজী আজীবন জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকের কথা। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সেই সময় এক কনকনে শীতের রাতে দীনদয়ালজী উত্তরপ্রদেশ সীমান্তঘেষা গ্রামে গিয়েছিলেন। সেই দরিদ্র গ্রামে মাওবাদীদের গালিগালাজ ও কাদা ছোঁড়ার জবাবে ক্রুদ্ধ না হয়ে, কুঁড়েঘরের সামনে শীতে কাঁপতে থাকা এক ভূমিহীন দিনমজুর বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে যান। নিজের গায়ের উলের শালটি বৃদ্ধকে জড়িয়ে দিয়ে, নিজের ঝোলা থেকে শুকনো রুটি ও গুড় ভাগ করে খেয়ে বলেছিলেন, 'রক্তাক্ত বিপ্লব বা হিংসার স্লোগান তোমার পেটে ভাত দেবে না। শ্রেণীসংগ্রাম মানুষকে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে লড়তে শেখায়, আর অন্ত্যোদয় চায় শেষ সারির শেষ মানুষটির চোখের জল মুছতে।'

আজ ইতিহাস তাঁর চূড়ান্ত রায় দিয়ে দিয়েছে। যে বামপন্থী মতাদর্শ হিংসা ও শ্রেণীসংগ্রামের ওপর ভর করে আধিপত্য চালাতে চেয়েছিল, তা আজ রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিলুপ্তির পথে। পক্ষান্তরে, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'একাত্ম মানবদর্শন' এবং 'অন্ত্যোদয়' আজ আধুনিক ভারতের সমাজকল্যাণমূলক শাসনের মূল ভিত্তি— যা অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা এবং জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে। □

With Best Compliments From-

A Well Wisher

মহামনীষার অভিযান

বার্নার্ড শ' ও তাঁর ভারত-অনুসন্ধান

গৌতম সেনগুপ্ত

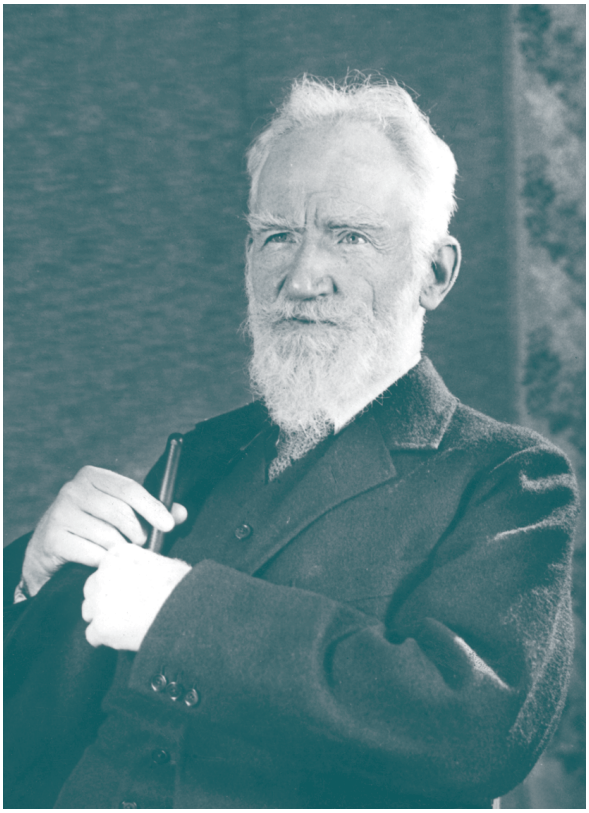

শিরোনাম দেখে চমকে ওঠার কোনো কারণ নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বার্নার্ড শ' অনেক ক্ষেত্রেই সমাদৃত—মূলত নাট্যকার, এছাড়া প্রযোজক, পরিচালক, সঙ্গীত ও সাহিত্য সমালোচক, রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং রাজনীতির ভাষ্যকার, নিরামিষাশী ইত্যাদি নানা পরিচয়ে তিনি বিশ্বের কাছে পরিচিত। তাঁর তীক্ষ্ণ তির্যক ব্যঙ্গরচনা মানুষকে যেমন হাসিয়েছে, তেমনি ভাবিয়েছে। এককথায়, সমকালীন বিশ্বে তাঁর তাৎপর্যময় উপস্থিতি কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না।

কাজেই, ১৯০৫—২০২৬ সময়কালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও ভাষায় তাঁকে নিয়ে নানারকমের চর্চা ও ভাবনা হয়েছে। দেশ বিদেশের কৃতী গবেষকরা তাঁর মনীষার বহুকৌণিকতা আবিষ্কার করেছেন।

সম্প্রতি বর্তমান লেখকের নজরে এসেছে শ'-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা গ্রন্থরাজির তালিকা। নানা বিষয়ে বিকীর্ণ বিপুল গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে, একটি বিশেষ অংশ, দুর্লভ মানিকের মতো, ভারতীয় হিসাবে আমাদের নজর কেড়েছে।

সেটি একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত গ্রন্থসম্ভার। পঞ্চাশখানারও বেশি বই তিনি সংগ্রহে রেখেছিলেন যা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ধর্ম, জীবনদর্শন, ধর্মশাস্ত্র, মহাকাব্য সম্পর্কিত। আরেকদিকে রয়েছে, ভারতের ইতিহাসের নানা পর্বের নানা সম্রাট অথবা সমকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের (১৭৫৭) সম্পর্কে লেখা নাটিকা। এমনকী বিভিন্ন কুখ্যাত কমিশনের রিপোর্টও। এই সংগ্রহের সঠিক সময় জানা না গেলেও, সে সময়টা তিনি হার্টফোর্ডশায়রের গ্রাম্য পরিবেশে তাঁর নিজের বাড়িতে থেকেছেন (১৯২০-১৯৫০), তার মধ্যেই সংগৃহীত বা তার আগে। যেটা নির্দ্বিধায় বলা যায় না, তা হলো এই বিপুল গ্রন্থরাজির কোনো কোনোটি তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন বা পড়েননি। তবে, যুক্তি একটাই যে, সংগ্রহ বা সংরক্ষণযোগ্য মনে না করলে তিনি নিশ্চয়ই জগৎবাসীর জন্য ভারত বা বড়ো অর্থে প্রাচ্য সম্পর্কিত এই সংগ্রহটিই রেখে যেতেন না।

যে তথ্যটি পাঠককে চুম্বকের মতো টানে তা হলো ভারতবর্ষের

> "সংস্কৃতির ইতিহাসে সর্বদাই চলেছে বিনিময়। এই দেওয়া-নেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়ার খেলায় বার্নার্ড শ'-এর 'অগ্রসরগামী বিবর্তনবাদ' যদি ভারত তথা প্রাচ্যের সংস্কৃতির কাছে ঋণে আবদ্ধ থেকে থাকে, সেই সুমহান সত্যকে আজ স্বীকার করবার সময় এসেছে।"

বা আরও বিশদভাবে বলতে গেলে, প্রাচ্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা। সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত পরিচিতি দেবার পরিসর এখানে নেই বলে অংশিকভাবে কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করছি মাত্র।

শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর 'গীতাঞ্জলি' (১৯১৩ সংস্করণ)। কিন্তু রবীন্দ্র রচিত কোনো নাটকের অনুবাদ এই সংগ্রহে নেই। এতে যদি মনে নানা প্রশ্ন আসে, তবে দ্বিতীয় বইটির উল্লেখ মনে হয় সূত্রসন্ধানে কাজে লাগবে। সেটি হলো 'One Hundred Poems of Kabir' অর্থাৎ ১০০টি কবীরের দোঁহা। সংকলন

করেছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এবং অনুবাদ করেছেন কবি স্বয়ং।

কিন্তু এতো মানুষ থাকতে 'কবীর' কেন? তিনি তো মধ্যযুগের একজন সন্তকবি মাত্র (আসলে পেশায় জোলা), তাও তাঁর দোঁহা হিন্দি ভাষায় রচিত।

বার্নার্ড শ'-এর চিন্তাজগতের মূল সূত্রটি না জেনে থাকলে এসব বইয়ের উল্লেখ নিতান্ত এলোমেলো মনে হবে। তা হলো 'Creative Evolution' বা সেই বিবর্তনবাদ যা ডারউইনের মত যান্ত্রিকভাবে পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা করে না শুধুই, বরং বর্তমানে পা রেখে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে বলে। ১৯০৩ সালে শ'-এর 'Man and Superman' নাটকটি রচিত হবার সময় থেকেই (অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতেই) বার্নার্ড শ' মানবজীবনের লক্ষ্য হিসেবে প্রচার ও প্রকাশ করেন 'সৃষ্টিমূলক বিবর্তনবাদ'-এর এবং নাটকটির ভূমিকাতে স্পষ্ট ভাষায় লেখেন যে প্রচলিত পন্থার রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পান একটি মাত্র আদর্শে। তা হলো এই যে, সম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির জোরে মানুষকে সচেতনভাবে তার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অতিক্রম করে তুলনামূলকভাবে 'আরও ভালো' মানুষ হবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এছাড়া আর তার মতো বিনষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। ঠিক এই রকমের জীবনভাষ্য পাশ্চাত্যে র অন্য কোনো চিন্তানায়কের কাছে পাওয়া যায়নি। তবে বহু বিতর্কিত জার্মান দার্শনিক নীৎশে-প্রচারিত 'Ubermensch' অর্থাৎ মানুষকে অতিক্রম করে মানবোত্তর হয়ে ওঠার সাধনতত্ত্ব শ'-এর ধারণাকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

ফরাসি দর্শনিক গাঁরি বেনমঁ-র মূল ফরাসিতে লেখা সৃষ্টিমূলক বিবর্তনবাদেরও সাযুজ্য রয়েছে। ১৯৩৩ সালে বার্নার্ড শ' ভারতবর্ষে আসেন, তবে বম্বে এবং সন্নিহিত জৈন মন্দির পরিক্রমা করে, এলিফ্যান্টা গুহা পর্যন্ত অভিযান করেন। কিন্তু সশরীরে আসবার আগেই তাঁর 'ভারত-প্রবেশ' শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ, কবীর ও গান্ধীকে কেন্দ্র করে।

এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে কেবলই দেখানো যেতে পারে 'গীতাঞ্জলি'-র রবীন্দ্র-বীক্ষার মূল সুরটি, যা হয়তো শ-এর চিন্তাধারার সঙ্গে মিলে গিয়ে থাকবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে নিয়ে ভাবা যেতে পারে। ইংরেজি সংস্করণের 'গীতাঞ্জলি' (The Song Offerings) শুরুই হচ্ছে যে কবিতাটির অনুবাদ দিয়ে তা হচ্ছে মূলে তাঁর বিখ্যাত গান/কবিতা— 'আমারে তুমি অশেষ করেছ / এমনি লীলা তব' (Thau hast made me endless, such is thy pleasure) । এখানে Thou , me ও thy শব্দের প্রয়োগ মানবোত্তর কোনো বিশাল বিপুল অথচ সপ্রেম দৃষ্টিকে ইঙ্গিত করে। 'I am here to sing thy songs' 'আমি হেথায় থাকি শুধু / গাইতে তোমার গান' অথবা 'I am only waiting for love to give myself up at lastin his hands. I am only waiting for them (আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে) ইত্যাদি। বিখ্যাত কবিতা 'চিত্তযেথা ভয়শূন্য / উচ্চ যেথা শির (Where the mind is fearless) রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ক্ষুদ্রতা ভুলে মানুষকে অসীমের স্বর্গে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। হয়তো এই রাবীন্দ্রিক ভুবনকেই শ'-এর অসীমের স্বর্গ বলে মনে হয়ে থাকবে।

এর পরেও কিন্তু কবীরের অন্তর্ভুক্তি প্রশ্নচিহ্ন রেখে যায়। কুয়াশা কেটে যাবে যদি মনে করতে পারি একাজে সুপণ্ডিত ও ভক্ত আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের ভূমিকা। এই মানুষটি ছিলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র কর্মধারায় এক বড়ো সহায়ক। আদিনিবাস বিক্রমপুরের 'সোনারঙ' জেলায় এক বৈদ্য পরিবারে। সেখানে তাঁর সংসার। এতসব সামলেও তিনি, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতোই থেকেছেন চির-বাউল বা চির-উদাসী। গুজরাট ও ভারতের নানা জায়গায় অসীম কষ্টে ঘুরে ঘুরে তিনি লুপ্তপ্রায় কবীরের দোঁহা এবং অন্যান্য মধ্যযুগীয় সন্তদের বাণী সংগ্রহ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের মানুষ হলেও তাঁর ছিল এক সর্বজনীন উদারতা। এইখানেই শ'-এর সঙ্গে তাঁর মস্ত মিল। সঙ্গে এসে মিললেন কবীর (অনুবাদের মাধ্যমে তা শ'-এর কাছেও পৌঁছোলো) যিনি শুকনো আচার অনুষ্ঠান এবং বেদান্ততত্ত্বের মনন-সর্বস্বতা এড়িয়ে এক বিশ্বজনীন অনুভূতিতে পৌঁছেছিলেন। অনুবাদে তা কিছুটা এইরকম—'আমি কাবাতে থাকি না, কৈলাসেও নয়....। আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা বাহুল্যমাত্র.....। যোগ ও ত্যাগের পথও আমার নয় ...। কবীর বলেন, ওহে সাধু, ঈশ্বর যে সকল নিঃশ্বাসেরও নিঃশ্বাস ইত্যাদি। কবীর বা রবীন্দ্রনাথ এখানেই মিলে যান এক মহৎ স্বপ্নে। 'কবীরের একশো কবিতা'-র রবীন্দ্র অনুবাদের ভূমিকায় আন্ডারহিল লিখছেন, 'এঁদের কাছে—ঈশ্বর অত্যন্ত মানবিক, গভীরতম প্রেমের পাত্র। সমস্ত সৃষ্টিই বিশ্বপ্রেমিকের সনাতন ক্রীড়া... এ হলো ব্রহ্মের প্রেম ও আনন্দের সর্বময় প্রকাশ—যা সর্বদাই জীবন্ত, পরিবর্তনশীল এবং এগিয়ে চলার পথের প্রেরণা।

এই দুখানি গ্রন্থ ছাড়াও, তিনি সযত্নে তাঁর সংগ্রহে রেখেছিলেন, জৈন, বৌদ্ধ, কনফুসিয়াসের অধ্যাত্মচেতনা। বিবেকানন্দের 'জ্ঞানযোগ', মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী 'My Expriment with Truth', উপনিষদ এবং রাধাকৃষ্ণন রচিত ভাষ্য ইত্যাদি। এসবের বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে চাই বৃহৎ পরিসরের সুযোগ।

সংস্কৃতির ইতিহাসে সর্বদাই চলেছে বিনিময়। এই দেওয়া-নেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়ার খেলায় বার্নার্ড শ'-এর 'অগ্রসরগামী বিবর্তনবাদ' যদি ভারত তথা প্রাচ্যের সংস্কৃতির কাছে ঋণে আবদ্ধ থেকে থাকে, সেই সুমহান সত্যকে আজ স্বীকার করবার সময় এসেছে।

(লেখক গুরুদাস কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজির অধ্যাপক ও গবেষক, সম্প্রতি প্রয়াত)



১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সত্যজিৎ রায় কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি ৫৪ মিনিটের 'রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রামাণ্য তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শনকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরে।

রবীন্দ্র অনুসারী সত্যজিৎ রায়

মনামি ঘোষ

চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের জীবন ও শিল্পকর্মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব অপরিসীম। বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতনে শিক্ষা, পারিবারিক সুসম্পর্ক এবং সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তর সর্বত্র তিনি গভীরভাবে রবীন্দ্র চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

সত্যজিতের জীবনে ও শিল্পে কবিগুরুর এই প্রভাবকে প্রধান কয়েকটি ভাগে আলোচনা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যজিৎ রায় এই দুজন বাঙ্গালি মনীষী তাঁদের নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাঙ্গালিকে পরিচিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে সরাসরি পারিবারিক সম্পর্ক না থাকলেও পারিবারিকভাবে ঠাকুর পরিবার ও রায় পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক ছিল।

সাহিত্য অর্থাৎ রবীন্দ্র উপন্যাসে সত্যজিৎ পিতা সুকুমার রায়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ্বকবির লেখা 'রাজর্ষি' উপন্যাসের মধ্যে। আসলে ঠাকুরবাড়ির পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ জায়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় এবং তদারকিতে প্রায় বছরখানেক চলেছিল 'বালক' পত্রিকা। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের যে দুই চরিত্র 'হাসি' ও 'তাতা' (সেই শিশুকন্যার পোশাকি নাম সুখলতা এবং শিশুপুত্রের নাম সুকুমার), সুকুমার রায় ও সুখলতার পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর সন্তানদের নামের সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রের নাম জড়িয়ে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে এই নিবন্ধে বংশ পরম্পরায় সত্যজিৎ রায়ের জীবন কীভাবে রবীন্দ্র অনুসারী বা গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর শৈশব থেকে চলচ্চিত্র জগতের অস্কার বিজয়ী হয়ে ওঠা তাই-ই প্রধান উপজীব্য এই বংশ পরম্পরায় রায় পরিবার ও ঠাকুরবাড়ির পরিবার কীভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তা নিয়ে বেশি পর্যালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সত্যজিৎ রায়ের চিত্ররূপ : স্কুলজীবনে একবার রবীন্দ্রনাথের একটি গান 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'-র (গীতবিতানের প্রকৃতি পর্যায়ভুক্ত) একটি চিত্ররূপ তিনি করেছেন এবং এই কারণে স্কুল থেকে তাঁকে পুরস্কৃতও করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন, 'যে কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়েছে তাকে কি সত্যিই দেখা হওয়া বলে? তাঁর কাছে ভয় সম্ভ্রমে জড়োসড়ো হয়ে কোনোক্রমে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়েছি, কিন্তু যতবারই এটা ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ আমার মায়ের দিকে মুখ তুলে বলেছেন 'তোমার ছেলেকে আমার আশ্রমে পড়াচ্ছ না কেন? সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর আশ্রমে যাবার কোনো বাসনা আমার ছিল না।'

প্রখ্যাত কবি সুকুমার রায়ের পিতৃবন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ইচ্ছানুসারে সত্যজিৎ রায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে পড়েছিলেন। অর্থনীতি যদিও তাঁর একেবারেই পছন্দের বিষয় ছিল না, ফলে মাঝপথে তিনি পড়া ছেড়ে দিলেন এবং চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে, কলা ভবনের ছাত্র হয়ে ছবি আঁকা শিখতে। যদিও এর আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাধিকবার তার দেখা হয়েছিল শৈশবেই। দু'বছর বয়সে সত্যজিৎকে নিয়ে সুকুমার রায় শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। সেই স্মৃতি শিশু সত্যজিতের মনে না থাকাই স্বাভাবিক। তাঁর নিজের ভাষায়, 'রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম কখন কাছ থেকে দেখি, তা আমার মনে নেই। যখনকার কথা মনে আছে তখন আমার বয়স সাত বছর। মায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম পৌষের মেলায়। সঙ্গে

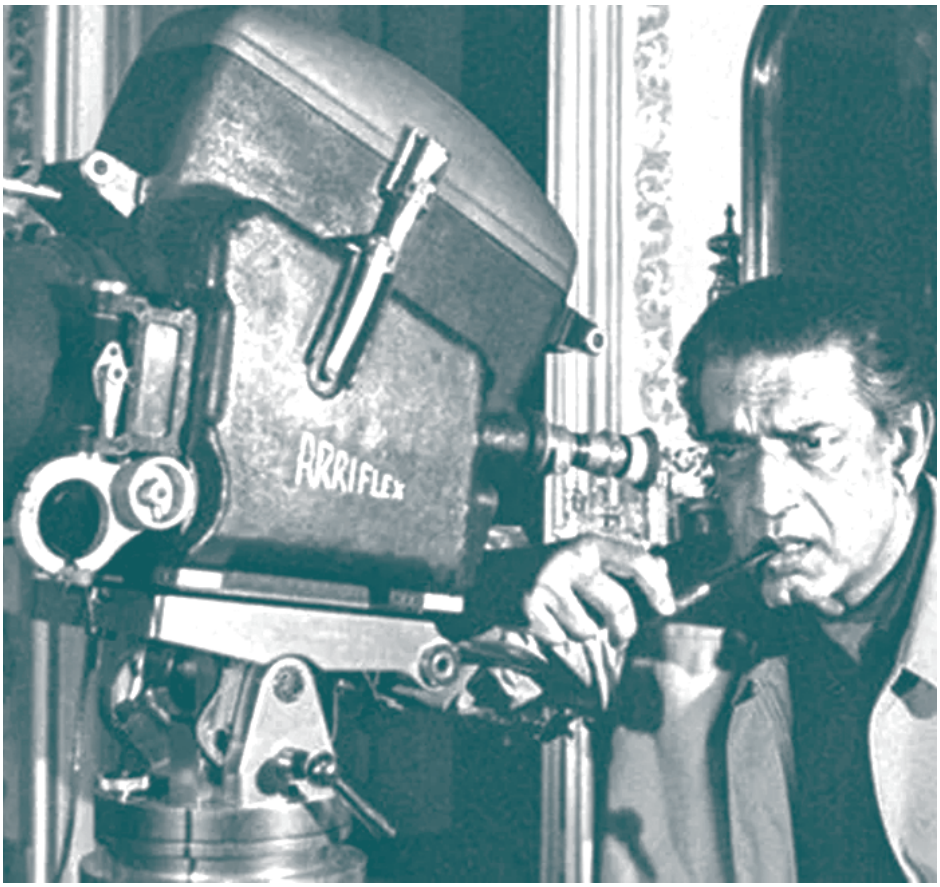

হোয়াইটঅ্যাওয়ে লাইডল দোকান থেকে কেনা নতুন অটোগ্রাফের খাতা। রবিবাবু নাকি খাতা দিলেই যখন তখন কবিতা লিখে দেন, তাই ভারী শখ আমার খাতার প্রথম পাতায় তাঁকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেব।'

সেই মতো সেবার উত্তরায়ণে সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কবি জানালার দিকে পিঠ করে চেয়ারে বসেছিলেন। সামনে টেবিলের উপর অনেক বই আর খাতা, সঙ্গে তাঁরও চিঠিপত্রের বিরাট অগোছালো স্তূপ ছিল। ধীর পায়ে সত্যজিৎ আবারও তাঁর কাছে গিয়ে অটোগ্রাফের খাতাটা দিলেন এবং সুপ্রভাদেবী কবিকে সেই খাতায় একটা কবিতা লিখে দেওয়ার অনুরোধ করলেন। সত্যজিৎ রায় লিখছেন, 'সেই খাতার প্রথম পাতা খুলে আমার দিকে এগিয়ে নিয়ে বললেন, এর মানে আরেকটু বড়ো হলে বুঝবে'।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ সাত বছরের সত্যজিতের অটোগ্রাফের খাতায় একটি আট লাইনের কবিতা লিখে উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে সে কবিতা সত্যজিতের ব্যক্তিগত মহল থেকে বেরিয়ে জনগণের দরবারে প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি হলো—

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।।
('স্ফুলিঙ্গ' ১৯৪৫)

পরবর্তীকালে যুবক সত্যজিৎ যখন কলাভবনের ছাত্র, তখন বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু করেননি। কারণ হিসেবে নিজেই কবুল করেছেন, 'তাঁর সামনে গিয়ে কী যে বলবো সেটা কোনো সময়ই ভেবে স্থির করতে পারিনি।' এরপর রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ এবং সত্যজিতের উত্থান— এই বিষয়টি ধীরে ধীরে বিকশিত হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রপ্রয়াণে ঠিক পরের বছর ডিসেম্বর মাসে সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি, ঝুলিতে কলাভবনের নানা অভিজ্ঞতা। নন্দলাল থেকে বিনোদবিহারীর প্রভাব থেকে বেরিয়ে তিনি কমার্শিয়াল আর্টের জগতে ঢুকে পড়েন। কলকাতায় গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে কাজ শুরু করেন।

১৯৪৫ সালে সুধীরচন্দ্র করের 'জনগণের রবীন্দ্রনাথ' বইটির প্রচ্ছদ এঁকে আবার রবীন্দ্রসাগরে সত্যজিৎ রায় অবগাহন শুরু করলেন। এরপর ১৯৫৫-তে অমল হোমের 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং ভারত সরকারের প্রকাশিত ডাকটিকিটের ডিজাইনটি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর অন্তরের আত্মীয়তা ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প ও উপন্যাসের চিত্ররূপ তাঁর সৃষ্টিশীলতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে 'চারুলতা' এবং 'সমাপ্তি', 'পোস্টমাস্টার', 'মণিহারা' অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় 'তিনকন্যা' নামে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেন। 'চারুলতা', 'তিনকন্যা' ও 'ঘরে বাইরে' এই তিন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনবদ্য সেলুলয়েড রূপায়ণ ঘটেছে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সত্যজিৎ রায় কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি ৫৪ মিনিটের 'রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রামাণ্য তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শনকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরে।

সাহিত্যের গল্পকে কীভাবে চলচ্চিত্রের পর্দায় রূপ দিতে হয় এবং সময়ের পরিসরকে কাজে লাগাতে হয়, তা তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকেই গভীরভাবে রপ্ত করেছিলেন।

এই ভাবেই বালক সত্যজিৎ রায় কবিগুরুর সৃজনী শিল্পে এক চিরস্মরণীয় বিস্তার ঘটিয়ে ছিলেন তাঁর চলচ্চিত্র এবং তথ্যচিত্র নির্মাণ কর্মের মধ্যে দিয়ে।□

বিজ্ঞান চেতনা ও কল্পনাবিলাসী রবীন্দ্রনাথ

ডঃ সমীরচন্দ্র দাস

অজ্ঞানতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব সমাজে কতগুলি ভুল ধারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের জন্ম দেয়। এই অন্ধবিশ্বাস থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য দায়িত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষের। রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজের জন্য এই দায়িত্বই পালন করেছিলেন। তাই এঁরা যেমন দার্শনিক, তেমন বিজ্ঞানীও বটে।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চার কথা উঠলে প্রথমেই মনে পড়ে যায় 'বিশ্ব পরিচয়'-এর কথা। এই প্রবন্ধ সংগ্রহটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন স্নেহাস্পদ বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। মুখবন্ধে প্রবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন— 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই।'

তাঁর আলোচনা তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছেন পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক এবং ভূলোক— এই কটি বিষয়ের মধ্যে। রচনাটি সাধারণের হাতে তুলে দেওয়ার অন্য উদ্দেশ্যটি ছিল সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা। যা তাঁর নিজের ভাষায়— 'বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই থরে থরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়। কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।'

শিশু বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর সেই আগ্রহ ক্রমে তাঁকে বিজ্ঞানপিপাসু করে তোলে। তাঁর



যুক্তিবাদী মন সর্বদাই বিজ্ঞানের আশ্রয় খুঁজেছে প্রকৃতিতে, মানবসমাজে, মানবমনে। এর অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে তাঁর কাব্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে। এককথায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দার্শনিক। তাঁর দর্শন যদিও ছিল ভাবে ভরা, তবে জীবনকে ঘিরে, বাস্তবতাকে নির্ভর করে। মহাকাশ ও তার গ্রহ-নক্ষত্ররাজি কবিমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। একাধিক রচনায় আমরা তার প্রকাশ দেখতে পাই, যথা—

"...ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভীড় আকাশের নীড়,
ঐ যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ, তারা, রবি...'

অথবা

"আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।"

অথবা

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
আমি মানব একাকী বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।।

উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অপার বিস্ময়ে মহাজাগতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জাগতিক কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানের অনেক জটিল তত্ত্বকে অতি সহজে উপস্থাপনা করতেও আমরা দেখেছি তাঁকে বিভিন্ন রচনায়। 'জীবিত ও মৃত' প্রবন্ধে কাদম্বিনীর পুনর্জীবন লাভের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

'জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না, তখনও অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে এবং সময়মতো মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ করে।'

অথবা 'স্ফুলিঙ্গ'তে এক স্থানে তিনি লিখলেন—

'অণুর আলোকনৃত্য উঠে
বিশ্বরচনার ছন্দ ফুটে।'

কী গভীর তত্ত্ব এই পঙ্‌ক্তি দুটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন তিনি! রবীন্দ্রনাথ পাঠককে 'পজিট্রন কণা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিশ্বপরিচয় প্রবন্ধে। মনে রাখতে হবে, প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে আর পজিট্রন কণা আবিষ্কৃত হয়েছিল সি ডি অ্যান্ডারসন দ্বারা ১৯৩৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে। এখানে বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানের জগতের সর্বাধুনিক আবিষ্কার সম্পর্কে তিনি কতখানি ওয়াকিবহাল থাকতেন। তিনি লিখলেন,

'মোটের উপরে সব ইলেকট্রনই না-ধর্মী বটে, কিন্তু এমন এক জাতের ইলেকট্রন ধরা পড়েছে যারা হ্যাঁ-ধর্মী অথচ ওজনে ইলেকট্রনেরই সমান। এদের নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন।'

কত সহজ সাবলীল তাঁর এই বর্ণনা। আবার নক্ষত্রের আলোর উৎস আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—

'ইলেকট্রন-প্রোটনের যোগে যদি কখনো একটি হিলিয়ামের পরমাণু সৃষ্টি করা যায়, তা হলে সেই সৃষ্টিকার্যে যে প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হবে, তার আঘাতে পৃথিবীতে একটি সর্বনাশী প্রলয়কাণ্ড ঘটবে। এইরকম কাণ্ডটাই ঘটছে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে। সেখানে বস্তুর ধ্বংসের কাজ চলছে বলেই অনুমান করা সঙ্গত।'

এখানেও দেখতে পাই অত্যন্ত জটিল 'অ্যাসট্রো ফিজিক্সের' বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কত সহজভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব, যখন তত্ত্ব সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা লেখকের মনে দানা বেঁধেছে।

পল্লীগ্রাম ছিল রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের অত্যন্ত কাছাকাছি। গ্রামের উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। 'পল্লীপ্রকৃতি' প্রবন্ধে পল্লীগ্রামের উন্নয়নের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— 'বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে।'

বোলপুরের কাছে শ্রীনিকেতনে কৃষিবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে গ্রামীণ মানুষের কাছে আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন এবং নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিজ্ঞান প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণও করেছিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণকালে সে দেশে কৃষিবিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বহু পত্রে তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি বিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশীর সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন— 'বিজ্ঞান শিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো আনা ফাঁকি। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে।'

শ্রীনিকেতনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে এই পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করবার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন।

বিজ্ঞানের বিবর্তন ঘটেছে দু'টি পথ ধরে। (১) বাস্তব অভিজ্ঞতা, পরীক্ষানিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পথে এবং (২) বুদ্ধি ও মননশীলতার দ্বারা প্রকৃতির নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলার স্বরূপ আবিষ্কারের মাধ্যমে। দ্বিতীয় পথটির দার্শনিক নিকটত্ব অনস্বীকার্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত করেন ফ্রান্সিস বেকন, রেনে দেকার্ত প্রমুখ বিজ্ঞানী।

দর্শন ও বিজ্ঞানের নৈকট্য বাস্তব ঘটনা। বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের শেখায় যে দর্শনের গর্ভ থেকেই বিজ্ঞানের আবির্ভাব। সক্রেটিস্‌ও তাঁর শিষ্য প্লেটোকে আমরা দার্শনিক হিসেবেই জানি। উভয়েই ছিলেন ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত জ্ঞানের উৎস মননশক্তি বা চিন্তাশক্তি। ডেমোক্রিটাস, থাঁলেস প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিকের পর্যবেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার রাস্তাকে তাঁরা গুরুত্ব দিতেন না। প্লেটোর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন অ্যারিস্টটল, কিন্তু অ্যারিস্টটলের চিন্তার পথ ছিল স্বতন্ত্র। দর্শন থেকে বিজ্ঞানকে তিনিই সর্বপ্রথম ভিন্ন পথে চালিত করার চেষ্টা করলেন। তাঁর গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করে, চিন্তন ও অনুসন্ধানের যুগলবন্দির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

এভাবেই দর্শন ও বিজ্ঞানের ধারা দুটি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে শুরু করে। কিন্তু আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা উচ্চতর স্তর প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে গিয়ে দর্শন ও বিজ্ঞান মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

সেজন্যই আমরা আইনস্টাইনকে বিজ্ঞানী বলবো না দার্শনিক বলবো বুঝতে পারি না। বার্ট্রান্ড রাসেল দার্শনিক না বিজ্ঞানী বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথের অবস্থানও ওই একই পর্যায়ে বলে আমার বিশ্বাস।

মানুষের মননশীল সমাজ উন্নয়নের সহায়ক। প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের নিবিড়তা কতকগুলি নিয়মশৃঙ্খলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা সেই নিয়মগুলিকে বুঝতে ও প্রয়োগ করতে সাহায্য করে। অজ্ঞানতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব সমাজে কতকগুলি ভুল ধারণা এবং কুপ্রথার জন্ম দেয়। এই কুপ্রথা ও অন্ধবিশ্বাস থেকে সমাজকে মুক্ত করার দায়িত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষের। রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজে এই দায়িত্বই পালন করেছিলেন। এঁরা দার্শনিক এবং এক অর্থে বিজ্ঞানীও। জর্জ বার্নার্ড শ', মার্ক টোয়েন, রমাঁ রল্যাঁ-র মতো চিন্তাবিদদের আমরা এই পর্যায়েই ফেলতে পারি।

বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান কাজ 'জানার মাঝে অজানারে সন্ধান করা'। অসত্যকে অপসারণ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের অনুভূতির সংযোগ লক্ষ্য করেছিলেন। মনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব তাঁর কবিমন দিয়ে অতি নিবিড়ভাবে অবলোকন করেছিলেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ অবশ্যই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পর্যায়ে পড়ে। মানবমন নিয়ে তাঁর চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে 'মনোগণিত' প্রবন্ধে।

'পাটিগণিত, রেখাগণিত ও বীজগণিতের নিয়মসকল পণ্ডিতগণ বাহির করিলেন; কিন্তু এখনো মনোগণিতে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রতিভাসম্পন্ন পাঠকদিগকে বলিয়া রাখিতেছি, একটা আবিষ্কারের পথ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও গুপ্ত রহিয়াছে। অনেক অশিক্ষিত যেমন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী ও নিয়ম না জানিয়াও কেবল বুদ্ধি, অভ্যাস ও শুভঙ্করের নিয়মে অঙ্ক কষিতে পারে, তেমনি কবিগণ এতকাল ধরিয়া মনোগণিতের অঙ্ক কষিয়া আসিতেছেন।'

প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তার বুঝি তুলনা হয় না। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের অনুভূতির সম্পর্ক তিনি যে সূক্ষ্মতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে তাঁর চিন্তার গভীরতা এবং বৈজ্ঞানিক মননশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অকপট স্বীকারোক্তি তাঁর মানসিকতার ঔদার্যই প্রমাণিত করে; যখন তিনি লেখেন—

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।'

ঠিক এমন কথাই না আমরা বলতে শুনেছি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনকে? □